জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫

নিরীক্ষা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর গণমাধ্যম সাময়িকী
২৫১-২৫৩তম সংখ্যা

অভ্যুত্থান মিডিয়া বয়ান

সম্পাদক
ফারুক ওয়াসিফ

সহযোগী সম্পাদক
সহুল আহমদ মুন্না

শিল্প নির্দেশনা
সোহেল আশরাফ খান

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

কম্পিউটার বিন্যাস
শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রচ্ছদ
দেওয়ান আতিকুর রহমান

প্রকাশকাল: জুন ২০২৫

মূল্য: ৫০ টাকা

ISBN: 978-984-35-4812-2

নিরীক্ষা

২৫১-২৫৩তম সংখ্যা: জুলাই ২০২৪ থেকে মার্চ ২০২৫

সম্পাদকীয়

সাংবাদিকতার পতন হলে সত্য অরক্ষিত হয়ে পড়ে, সমাজ দিশা হারায় এবং রাষ্ট্রের পতন ঘনিয়ে আসে। বাংলাদেশে সাংবাদিকতার এই পতন ঘটেছিল সংবাদমাধ্যমের ওপর দরবারি ন্যারেটিভের চাপাচাপিতে। 'মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি', 'জঙ্গিবাদী চক্রান্ত', 'উন্নয়নে চ্যাম্পিয়ন' জাতীয় বয়ান টেকাতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল স্বৈরাচারের দেড় দশকে। ২০২৪-এর জুলাই তাই শুধু বাংলাদেশের পুনর্জন্মই না, সাংবাদিকতার পুনর্জন্মেরও সুযোগ নিয়ে এসেছিল। সেই সুযোগের প্রতি যে সুবিচার করা হয়েছে, তা বলা যাবে না।

জুলাই ঘটতে পেরেছিল, কারণ ফ্যাসিবাদের বয়ান ধসে পড়েছিল। তখন বোঝা গিয়েছিল যে, দেশের মানুষের বিরুদ্ধে, দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যে দানবীয় শক্তি আধিপত্য করছিল; তার প্রাণভোমরাটা লুকানো ছিল ন্যারেটিভের লুকানো কৌটায়। তরুণ-তরুণীরা নিজেদের কায়দায় পাঠচক্র করে, সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাক্টিভিজম দিয়ে, ইউটিউবে প্রচার চালিয়ে ক্ষমতার ন্যারেটিভ গেরিলা কায়দায় গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। এবং বিস্ময়ের ব্যাপার–দরবারি মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবের বাইরে একটি প্রজন্ম নিজেদের তৈরি করেছিল। মিডিয়ার মতাদর্শ ও বুদ্ধিজীবীদের আওতার বাইরেই তাদের বিকাশ ঘটেছিল। বলা যায়, মিডিয়া পরিবেশিত বুদ্ধিবৃত্তি জুলাইয়ের আভাস পেতে ব্যর্থ হয়েছিল, জুলাইয়ের গতিপ্রকৃতিও তাদের বোধে অধরাই থেকে গিয়েছিল। অর্থাৎ, দাপট থাকলেও প্রভাব হারিয়ে গিয়েছিল। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে তথ্যপ্রযুক্তির ঘাতক ভূমিকা যেমন সত্য, তেমনই তার মুক্তিকামী ব্যবহারও সত্য।

ফ্যাসিবাদের দেশীয় ন্যারেটিভ অকেজো হয়ে পড়লেও জুলাইয়ের পর বাংলাদেশকে মোকাবিলা করতে হয় বহিরাগত বয়ানের। সেই বয়ানে জুলাই মানে সহিংসতা, কালার রেভ্যুলেশন, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, ডানপন্থার প্রতিবিপ্লব ইত্যাদি। চলতে থাকে অপতথ্যের আগ্রাসন। বিশেষ করে ভারতীয় মিডিয়ায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বয়ানের সঙ্গে মিলে যায় পতিত স্বৈরাচারের বয়ান। সেই বয়ান বাংলাদেশি গণমাধ্যমের কোনো কোনো অংশে পুনরুৎপাদিতও হতে থাকে। ফ্যাসিবাদী বয়ান তৈরিতে সাংবাদিকতার দায়টা আবারও প্রমাণিত হতে থাকে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ছিল সাংবাদিকতারও রক্তপরীক্ষা। অন্তত ৪ জন সাংবাদিক পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। আহতের সংখ্যা অন্তত ৩৫০। পাশাপাশি ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়েন কিছু কিছু সাংবাদিক। কেবল আন্দোলনকারীদের হত্যার উসকানি নয়, স্বৈরাচারকে গ্রহণযোগ্য করা নয়–অনেকে সরাসরি পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের সহযোগী হিসাবে রাজপথে নামেন। এদিক থেকেও জুলাই বাংলাদেশি সাংবাদিকতার এক কলঙ্কজনক অধ্যায় যেমন, তেমনই তা সাহসিকতারও নতুন পরিমাপ হাজির করেছে।

দীর্ঘ বিরতির পর প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর গণমাধ্যম সহায়িকা 'নিরীক্ষা' প্রকাশিত হচ্ছে নিয়মিত হওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে। বাংলাদেশ এক দীর্ঘ জুলাই অতিক্রম করছে। বর্তমান সংখ্যার লেখাপত্রেও এর ছাপ থাকাই স্বাভাবিক। গণমাধ্যমবিষয়ক আলোচনা ও গবেষণাকে আশ্রয় করে নিরীক্ষার পরের সংখ্যারও প্রস্তুতি চলছে। সাংবাদিকতা পেশা ও এর অধ্যয়নের কাজে নিরীক্ষা প্রাসঙ্গিক ও দরকারি হয়ে থাকবে–এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আজকের সময়ে এ ধরনের পত্রিকার জরুরত আরও বেশি। কারণ, বাস্তবতা বলে যে ধারণা, তা আধুনিক সময়ে মিডিয়ার মাধ্যমেই নির্মিত ও পরিবেশিত হয়। বলা যায়, আমরা এক 'মিডিয়া মেডিয়েটেড রিয়েলিটির' বাসিন্দা। সম্প্রতি এআই প্রযুক্তি এসে অপতথ্য, ভুল তথ্য ও বিষাক্ত বয়ানের মাধ্যমে 'বাস্তবতা' গড়েও নেওয়া হচ্ছে। আগামী সংখ্যায় এই নতুন পরিস্থিতিকে বুঝে দেখার প্রয়াস থাকবে।

সূচিপত্র

স্বৈরতন্ত্রের মিডিয়া মেকানিজম ও ফ্যাসিবাদী বয়ান ৩
খোরশেদ আলম

নিপীড়নবিরোধিতা থেকে গণ-অভ্যুত্থান
দেড় দশকে বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতার রূপ ৮
ফাহমিদুল হক

লাইক, শেয়ার, মুক্তি
গণ-অভ্যুত্থানের পরোক্ষ অভিব্যক্তি ও হাজির থাকার রাজনীতি ১৩
ইমরান কামাল

ভারতীয় মিডিয়ায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পরিবেশনার ধরন ১৭
সারোয়ার তুষার

জুলাই-আগস্ট হত্যাযজ্ঞ ও সাংবাদিকদের দায় ২৮
এ কে এম জাকারিয়া

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান
সহিংসতাবিষয়ক বয়ানের রকমফের ৩১
সহুল আহমদ

৩৯ জুলাইয়ের রাজপথে: সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতা
ইয়াসির আরাফাত

৪৩ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে হতাহত সাংবাদিক
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

৪৯ দেওয়ালে দেওয়ালে জনরোষ, নাকি
নতুন করে লেখা সংবিধান?
সিলমী সাদিয়া

৫২ অপতথ্যের আগ্রাসন
৫ আগস্ট-পরবর্তী বাংলাদেশের কয়েকদিন
দেওয়ান তাহমিদ

৫৭ গণমাধ্যম সংবাদ

৭১ পিআইবি সংবাদ

৭৫ জুলাই গ্রাফিতি

মূল্য ৫০ টাকা

পিআইবির সকল প্রকাশনা পেতে: প্রকাশনা কর্মকর্তা, পিআইবি এবং বাতিঘর, ঢাকা ও চট্টগ্রাম
অনলাইনে: www.rokomari.com; মোবাইল: ০১৯১৩০২৪১৫১

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং মিতু প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং
১০/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ০২-৪১০৩২৯১৩, ০২-৪১০৩২৯২৫-২৬, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৪১০৩২৯১৪
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

খোরশেদ আলম

স্বৈরতন্ত্রের মিডিয়া মেকানিজম ও ফ্যাসিবাদী বয়ান

গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সঙ্গে একটি রাষ্ট্রে অধিকসংখ্যক গণমাধ্যমের থাকা-না-থাকার কোনো সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশ এর ভালো উদাহরণ। সরকারি হিসাবমতে, ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ৪৫টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, ২৮টি এফএম রেডিয়ো, ৩২টি কমিউনিটি রেডিয়ো, ১ হাজার ২৪৮টি দৈনিক পত্রিকা এবং শতাধিক অনলাইন নিউজ পোর্টাল ছিল। অথচ এ সময়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ছিল সর্বনিম্ন।[১] জুলাই-আন্দোলনসংক্রান্ত তথ্যের জন্য মানুষ প্রধানত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ইন্টারনেট শাটডাউনকালে অনন্যোপায়ী মানুষ সংবাদপত্রের ওপর কিঞ্চিৎ নির্ভর করে। সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম দাবি করেন, জুলাই-আন্দোলনে ইলেকট্রনিক মিডিয়া কিছুই প্রচার করেনি।[২] জুলাই-আন্দোলনে টেলিভিশন চ্যানেলের চেয়ে সংবাদপত্র তুলনামূলক পেশাদারির পরিচয় দিয়েছে, যদিও তা ধর্তব্য নয়। রাষ্ট্রের একমাত্র টেলিভিশন চ্যানেলের ওপর জনগণের ক্ষোভ এতটাই তীব্র ছিল যে, বিটিভির একাংশ আগুনে পুড়ে গেলে সাহায্য চেয়ে তারা যে ফেসবুক পোস্ট দেয়, সেখানে ১ লাখ ৩১ হাজার রিঅ্যাকশনের মধ্যে ১ লাখ ১৭ হাজারই ছিল 'হাহা রিঅ্যাক্ট'।[৩]

গণমাধ্যমের মালিকানা

> *৪৫০টি কুরিয়ার সার্ভিসের গাড়িতে এসএটিভির লোগো! কারণ মালিকের কুরিয়ার সার্ভিসের ব্যাবসা আছে। মালিক বলছেন, দেশের বিভিন্ন জায়গায় আসা-যাওয়ার সময় যে পরিমাণ চাঁদা দিতে হয়, তা না দিয়ে সে টাকা দিয়ে একটা টেলিভিশন চ্যানেল দিয়ে ফেললাম![৪]*

গণমাধ্যম লাইসেন্স বা রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল, পরিবার ও ব্যাবসায়িক পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়েছে বিগত সরকার।[৫] লাইসেন্স প্রদানে স্বচ্ছ নীতিমালা অনুসরণ করা হয়নি। বরং নানা অজুহাত তুলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেল ও সংবাদপত্রকে; যেমন: চ্যানেল ওয়ান, সিএসবি, চ্যানেল এস, এসটিভি, আমার দেশ প্রভৃতি। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের টিভি চ্যানেল নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার ছিল লাইসেন্স বাতিল করা। যেকোনো টেলিভিশন চ্যানেলকে যেকোনো সময়ই সরকার বন্ধ করে দিতে

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢা.বি.

চব্বিশের গ্রাফিতি; ঢাকা

পারে–এই ভীতি তাড়িয়ে বেড়াত চ্যানেল মালিকদের। তথ্য-উপাত্ত বলছে, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট স্থাপনের পর এ নিয়ন্ত্রণ আরও পাকাপোক্ত হয়।

পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার কোনো শর্ত মানা হয়নি। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ২০১৬ সালের এক হিসাব বলছে, দেশের ৯৩ শতাংশ পত্রিকার মালিকই সে পত্রিকার সম্পাদক এবং পরিবারের সদস্যরাই তাঁদের মালিকানাধীন গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকেন।[৬] যেমন: বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যানের ছেলে সায়েম সোবহান আনভীর হচ্ছেন ওই গ্রুপের 'নিউজ ২৪' চ্যানেলসহ তাদের অপরাপর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। জেলা পর্যায়ে পত্রিকার রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে জেলা প্রশাসকের হাতে, যা আদতে সরকারের ইচ্ছাধীন। বাংলাদেশের মিডিয়া খাতে বড়ো অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ লাভজনক নয় বরং পুঁজিপতিদের কালোটাকা সাদা করা কিংবা অবৈধ উপায়ে কামানো টাকাকে নিরাপত্তা দেওয়ার একটি প্রক্রিয়া হচ্ছে গণমাধ্যমের মালিকানা লাভ।[৭] নিজেদের ব্যাবসায়িক স্বার্থরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ গণমাধ্যম মালিকদের আরেকটি উদ্দেশ্যে। ব্যাংক-বিমা ও রিয়েল-এস্টেট থেকে শুরু করে গণমাধ্যম মালিকদের হরেকরকম ব্যাবসা রয়েছে। কারও কারও বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ, দুর্নীতি, অর্থ পাচারসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। ব্যক্তিগত ও ব্যাবসায়িক স্বার্থের দ্বন্দ্ব (কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট) প্রকাশ না করেই তারা অপরাপর ব্যাবসার পাশাপাশি গণমাধ্যম ব্যাবসাও চালিয়ে যাচ্ছেন। টিভি চ্যানেল মালিকরা গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা ও দায়বদ্ধতার চেয়ে নিজেদের রাজনৈতিক ও ব্যাবসায়িক স্বার্থের ব্যাপারে যে অতি মনোযোগী, তা নিচের উদাহরণ থেকে বোঝা যায়। বাংলাদেশের বেসরকারি টেলিভিশন মালিক সমিতির সংগঠনটির নাম হচ্ছে 'অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স' (এটকো)। ২০১২ সালের 'প্রাইভেট টেলিভিশন চ্যানেল অন ওনারশিপ এস্টাবলিশমেন্ট অ্যান্ড অপারেশন'-এর খসড়া নীতিমালার ৫নং ধারায় বলা হয়, যেকোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি চ্যানেলের মালিক হতে পারবেন না। এটকো এটি সম্পূর্ণ বাতিলের সুপারিশ করে। খসড়াটির ১৪ ধারায় বলা হয়, মোট বিজ্ঞাপন সময় অনুষ্ঠানের ২০ শতাংশের বেশি হবে না। এটকো সেটিকেও বাতিলের সুপারিশ করে।[৮] অথচ আমেরিকার টেলিভিশন চ্যানেল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশন (এফসিসি) ঘণ্টায় ৮ মিনিটের বেশি বিজ্ঞাপনকে অনুমোদন করে না।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও পরিচালনা পদ্ধতি

বাংলাদেশের গণমাধ্যমের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও পরিচালনা পদ্ধতি উঁচু থেকে নিচু পর্যন্ত ক্রমবিভক্ত (হায়ারার্কিক্যাল) ও পুরুষশাসিত! গণতান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ অতি সীমিত। গণমাধ্যমের অভ্যন্তরের সব কার্যক্রম পরিচালিত হয় টপ-ডাউন প্রক্রিয়ায়। মালিকের ব্যাবসা ও চাহিদা, কর্তাব্যক্তিদের ইচ্ছা, বিজ্ঞাপনদাতাদের চাপের কাছে নতজানু গণমাধ্যমের সম্পাদকীয় স্বাধীনতা। নিউজ অ্যাসাইনমেন্ট, ট্রিটমেন্ট, কাভারেজ, গেস্ট সিলেকশন–সর্বত্র গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত। সংবাদ কিংবা টকশো উপস্থাপক কে হবেন, অনেক ক্ষেত্রে তাও চাপানো হয় মালিকপক্ষ থেকে। মালিকের ইচ্ছা হলে তিনি তাঁর চ্যানেলে সস্ত্রীক (যেমন: এটিএন বাংলার ড. মাহফুজুর রহমান ও ইভা রহমান) গানও পরিবেশ করতে পারেন। কোনো কোনো গণমাধ্যমের পেশাদারি তলানিতে।

বিজ্ঞাপন: সরকারি ও বেসরকারি

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) সার্কুলেশনের ভিত্তিতে পত্রিকাকে সরকারি বিজ্ঞাপন বরাদ্দ দিয়ে থাকে। ডিএফপি সার্কুলেশনের ভিত্তিতে প্রতিবছর পত্রিকাগুলোর র‍্যাংকিং করে। র‍্যাংকিং-এ যে পত্রিকাকে যত উপরে দেখানো হয়, সে পত্রিকা তত সরকারি বিজ্ঞাপন বরাদ্দ পায়। মূলত সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়া আর রেয়াতি হারে (নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে কর) শুল্ককর দিয়ে নিউজপ্রিন্ট আমদানি সুবিধার জন্য দুর্নীতির মাধ্যমে কোনো কেনো পত্রিকার প্রচারসংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দেখানো হয়। পত্রিকার প্রচারসংখ্যার ওপর সরকারি বিজ্ঞাপনের দর এবং নিউজপ্রিন্টের প্রাপ্যতা নির্ভর করে। ডিএফপির কিছু অসাধু কর্মচারীর জালিয়াতি এবং সরকারের ইচ্ছানুসারে এ র‍্যাংকিং তৈরি করা হয়। অচেনা-অজানা অনেক আন্ডারগ্রাউন্ড ও দেওয়ালপত্রিকাই সরকারের

আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে বিপুল পরিমাণ সরকারি বিজ্ঞাপন পেয়ে থাকে। এসব পত্রিকা অনেক সময় সরকারদলীয় লোকজনের হয়ে থাকে। ডিএফপির তালিকায় এখন প্রচারসংখ্যার শীর্ষ ইংরেজি দৈনিক 'দ্য ডেইলি ট্রাইব্যুনাল', যার প্রচারসংখ্যা হচ্ছে ৪০ হাজার ৫০০।[৯] প্রচারসংখ্যায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রাখা হয়েছে 'ডেইলি ইন্ডাস্ট্রি' ও 'দ্য বাংলাদেশ নিউজ'। সরকারি তালিকায় 'দ্য ডেইলি স্টার'-এর স্থান চার নম্বরে। ইংরেজি দৈনিক 'নিউ এজ' রয়েছে তালিকার ১৪ নম্বরে।[১০] স্বল্পমূল্য, বাজে ডিজাইন, অর্থপ্রাপ্তির দীর্ঘসূত্রতা প্রভৃতি কারণে অনেক বড়ো পত্রিকাই সরকারি বিজ্ঞাপন ছাপতে আগ্রহী থাকে না।

অন্যদিকে বেসরকারি বিজ্ঞাপনের ওপর অতি-নির্ভরতার কারণে সাংবাদিকদের মধ্যে সেলফ সেন্সরশিপ কাজ করে। বিজ্ঞাপনের ফাঁকে ফাঁকে চ্যানেলগুলোয় সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচার হয়, যা একদিকে যেমন দর্শক-শ্রোতাকে টেলিভিশনবিমুখ করে তুলেছে, অন্যদিকে বিজ্ঞাপনদাতার বিরুদ্ধে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করা সম্ভব হচ্ছে না। আবার অপছন্দের মিডিয়াগুলোকে সরকার একদিকে যেমন সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত করে, অন্যদিকে গোয়েন্দা সংস্থার নির্দেশ থাকে যেন সরকারের অপছন্দের গণমাধ্যমকে বিজ্ঞাপন দেওয়া না হয়।[১১] বিজ্ঞাপনী সংস্থা ও গণমাধ্যমের মধ্যে সম্পর্কও অস্বচ্ছ। পারস্পরিক মিথোজীবিতার মাধ্যমে প্রথম সারির চারটি টিভি চ্যানেল প্রায় ৫০ শতাংশ বিজ্ঞাপন ভোগ করে। এভাবে বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলো গণমাধ্যমের সম্পাদকীয় নীতি ও আয় নিয়ন্ত্রণ করে।[১২] ফলে সংবাদের নামে অনেক সময় আমরা 'অ্যাডভাটোরিয়াল' (সংবাদের নামে ছদ্ম বিজ্ঞাপন) দেখতে পাই। আশরাফ কায়সার জানান, দেশের প্রধান বিজ্ঞাপনী সংস্থা (এশিয়াটিক) বিজ্ঞাপনের গোটা বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে, যার ব্যবস্থাপনা পরিচালক হচ্ছেন বিগত সরকারের একজন সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, যিনি এ মুহূর্তে জেলে। তিনি জানান, বাংলাদেশে বিজ্ঞাপনের বাজার ৪০০০ কোটি টাকা।[১৩] ২০০০ হাজার কোটি পাচ্ছে ইউটিউব-ফেসবুক, বাকি ২০০০ হাজার কোটি টাকার ৮০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে এশিয়াটিক। বিজ্ঞাপনী সংস্থাটি বাংলাদেশের মিডিয়াকে স্বল্পরেটে বিজ্ঞাপন প্রচার/প্রকাশে বাধ্য করে আসছে দীর্ঘদিন, যা বিজ্ঞাপন মূল্যের দিক থেকে পৃথিবীর সর্বনিম্ন। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে টিআরপি (টার্গেট রেটিং পয়েন্ট) রেটিং বন্ধ আছে। বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞরা বলছেন, টিআরপি রেটিংকে ডিজিটালাইজ করা, একাধিক প্রতিষ্ঠানকে রেটিং করার দায়িত্ব দেওয়া এবং এক্ষেত্রে ভারতের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা জরুরি। পাশাপাশি চ্যানেলগুলোকে নয়া প্রযুক্তি ও দর্শক-শ্রোতা সম্পর্কে অধিকতর তথ্য সংগ্রহে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

গণমাধ্যমের ফ্যাসিবাদী তৎপরতা ও বয়ান

একদলীয় শাসনব্যবস্থা সুসংহত করার স্বার্থে বিগত অনির্বাচিত সরকারকে বিচিত্র ধরনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বয়ান নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করতে হয়েছে। এসব বয়ান উৎপাদন, পুনরুৎপাদন, বিস্তার ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার বিশ্বস্ত দায়িত্বে ছিল সরকারের মদতপুষ্ট গণমাধ্যম ও বশংবদ সাংবাদিককুল। ফ্যাসিবাদী সরকারের প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী নয়–এমন গণমাধ্যমও সেসব বয়ান সমর্থন করে জ্ঞাত-অজ্ঞাতে সরকারের প্রোপাগান্ডায় শরিক হয়েছে। জনভিত্তি ছিল না বলে বিগত সরকারকে তাদের শাসনকালীন অন্য সময়কালের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণ প্রোপাগান্ডা মেশিনারিনির্ভর থাকতে হয়েছে। অন্যদিকে তিন-তিনটি প্রহসনমূলক নির্বাচনকে বৈধ করতে এবং জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরাতে ফ্যাসিস্ট রেজিমকে বিস্তর ডিসকোর্স তৈরি করে তা গণমাধ্যমের মাধ্যমে আমপাবলিকের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় সব গণমাধ্যমই হয়ে উঠেছে সরকারি মুখপত্র! পেশাদারির মানদণ্ডে এগিয়ে থাকা প্রথম আলোর মতো পত্রিকাকেও শেখ হাসিনার জন্মদিনে প্রথম পৃষ্ঠাজুড়ে কাভারেজ দিতে দেখা গেছে! টিকে থাকার স্বার্থে কিংবা লোভের বশবর্তী হয়ে সরকার যা চায়, যেভাবে চায়, গণমাধ্যম তা-ই করে গেছে! যেহেতু সরকারদলীয় লোকজনই ছিল গণমাধ্যমের মালিক-হর্তাকর্তা, সুতরাং সরকারের বা ক্ষমতাসীনদের ভাষ্য প্রস্তুতে অনেক ক্ষেত্রে সরকারকেও নিজ থেকে দুকথা বলে দিতে হয়নি। অনেক গণমাধ্যম স্ব-উদ্যোগেই স্তাবকতা চালিয়ে গেছে সরকারের নেক নজরে থাকার নিমিত্তে।

পেটোয়া সাংবাদিকতা: ফোনকল ফাঁস

সরকার ও ক্ষমতাসীন দল, দেশীয় গোয়েন্দা সংস্থা, পার্শ্ববর্তী দেশের গোয়েন্দা সংস্থা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং গণমাধ্যম-সাংবাদিকদের একাংশের মধ্যে একটা আঁতাঁতমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে বিগত ফ্যাসিবাদী শাসনামলে। এটিকে বাংলাদেশি স্টাইলের এমবেডেড জার্নালিজম বা লেজুড়বৃত্তিক সাংবাদিকতা বলা চলে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আ-আল মামুন গণমাধ্যমের সঙ্গে ক্ষমতার এ মিথোজীবিতামূলক সম্পর্কের নাম দিয়েছেন 'শিকারি সাংবাদিকতা'।[১৪] উদাহরণ হিসাবে অধ্যাপক মামুন বলেন, ২০২২ সালে হেফাজত নেতা মামুনুল হকের সঙ্গে স্ত্রীর কথোপকথনের একটি রেকর্ড ফাঁস করে 'চ্যানেল ৭১'। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা আগমনের বিরোধিতা করে রাজপথে মিছিল করার কয়েকদিন পরই মামুনুল হকের ফোনকল ফাঁস করা হয়। স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের মিডিয়া কেবল ক্ষমতাসীন সরকার ও দলের স্বার্থই রক্ষা করে না, পাশাপাশি বিগত সরকার আমলে ভারত রাষ্ট্রের স্বার্থেও কাজ করেছে। আ-আল মামুন দাবি করেন, সরকার, গোয়েন্দা সংস্থা, মিডিয়া ও সুশীলসমাজের একাংশের সহায়তায় 'শিকারি সাংবাদিকতার' সূচনা হয় ২০০৭ সালের সেনা-সমর্থিত ফখরুদ্দীন সরকার আমল থেকে, যা পরবর্তী ১৫ বছরের আওয়ামী শাসনে ব্যাপকভাবে চর্চিত হয়। ফলে সরকার তার দরকারি মুহূর্তে ফোনকল ফাঁস করে তা বিভিন্ন গণমাধ্যমের হাতে তুলে দিলে তারা সরকারের জনসংযোগ অফিসের ভূমিকায় থেকে ব্রেকিং নিউজ হিসাবে দর্শক-শ্রোতার মাঝে তুলে ধরত এবং সরকারের পরিকল্পনামতো জনতা সাময়িক সময়ের জন্য ফোনকল ফাঁসালাপ ইস্যুতে ব্যস্ত থাকত!

উন্নয়ন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

উন্নয়ন না গণতন্ত্র? বিগত শাসনামলে অন্যতম বিতর্কের বিষয় ছিল এটি। খুবই উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে বিতর্কটি সামনে এনেছে ফ্যাসিবাদী সরকার, যেন বা এ দুয়ের মধ্যকার সম্পর্কটি দ্বান্দ্বিক। প্রহসনমূলক নির্বাচনি ব্যবস্থায় টিকে থাকতে হয়েছিল বলে আওয়ামী লীগকে উন্নয়ন, উন্নয়নের ধারাবাহিকতা, উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সরকার, পৃথিবীর জনপ্রিয় একনায়কসমূহ, আগে উন্নয়ন পরে গণতন্ত্র, ইনক্রেডিবল বাংলাদেশ, বাংলাদেশ প্যারাডক্স, মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ প্রভৃতি তথ্য-উপাত্ত-ডিসকোর্সকে বাজারজাত করতে হয়েছে। উন্নয়নের উদাহরণ হিসাবে মেট্রোরেল, পদ্মা সেতু, চট্টগ্রাম টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রভৃতিকে প্রজেক্ট করা হতো গণমাধ্যমে। পদ্মা সেতুর প্রতিটি স্প্যান নিয়েও বাংলাদেশের অধিকাংশ গণমাধ্যম প্রতিবেদন করেছে বা করতে হয়েছে, যা 'স্প্যান সাংবাদিকতা' নামে পরিচিত। পদ্মা সেতু নিয়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে হাজার হাজার প্রতিবেদন হয়েছে। পত্রিকাগুলোয় সরকারি

প্রেস রিলিজ পাঠানো হয়েছে যেন পদ্মা সেতু নিয়ে নেতিবাচক কোনো সংবাদ পরিবেশন না করা হয়! পদ্মা সেতুর মিডিয়া কাভারেজ নিয়ে বিভিন্ন গবেষণায়[১৫] কিছু সুনির্দিষ্ট মিডিয়া ফ্রেমিং এবং সরকারের এজেন্ডা সেটিং লক্ষ করা গেছে: (১) উন্নয়নের বাতাবরণে অনির্বাচিত সরকারকে বৈধ করে তোলা, (২) জাতীয়তাবাদী জোশ তৈরি (যেমন: আমরাই পারি, আমাদের সক্ষমতা, মুক্তিযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড়ো অর্জন, বিশ্বব্যাংকের সমালোচনা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, (৩) বিরোধী পক্ষকে অভিযুক্ত করা (বিএনপি-জামায়াত ও ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সমালোচনা) এবং (৪) ব্যক্তিবন্দনা (বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন, একমাত্র শেখ হাসিনাই পারে, লৌহমানবী হাসিনা প্রভৃতি)। গণমাধ্যমের এ 'স্তুতি সাংবাদিকতার' ডামাডোলে বাদ পড়ে গেছে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য, যা জানার অধিকার যেমন জনগণের আছে, তেমনই গণমাধ্যমেরও তা জানানোর দায়বদ্ধতা রয়েছে। যেমন: মোহাম্মদ আজম দাবি করেন, বাংলাদেশের অবকাঠামোর প্রতি ইউনিটের নির্মাণ-ব্যয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ আর মজুরি পৃথিবীর সর্বনিম্ন।[১৬] এসব প্রসঙ্গ গণমাধ্যমে ঠাঁই পায়নি। পাশাপাশি নব্য-উদারনৈতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ডিসকোর্স নিয়ে পৃথিবীব্যাপী যে তীব্র সমালোচনা হচ্ছে, বাংলাদেশের গণমাধ্যমে সে আঁচও লাগেনি!

অন্যদিকে গোয়েন্দা সংস্থার তুমুল খবরদারি ও সরকারের নানাবিধ বিধিনিষেধের কারণে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাও অনেকটা নাই হয়ে গেছে বিগত ফ্যাসিবাদী আমলে। যেমন: দেশে শত শত ক্রসফায়ার ও গুমের ঘটনা ঘটলেও সংবাদমাধ্যমে তা নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রায় শূন্য! ক্রসফায়ার প্রতিবেদন রূপ নিয়েছে ধারাভাষ্যে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাঠানো 'মাঝরাতে ওত পেতে থাকা কতিপয় সন্ত্রাসী ও তাদের মধ্যকার অতর্কিত গোলাগুলিতে নিহত' নামক গল্পগুচ্ছ কিংবা প্রেস রিলিজই ছিল আমাদের ক্রসফায়ার সাংবাদিকতা।

সেক্যুলার, প্রগতিশীল, মৌলবাদবিরোধী, বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি

মোহাম্মদ আজমের দাবি, পঁচাত্তর-পরবর্তী পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আশির দশক থেকে চারটি বর্গের–সেক্যুলার, প্রগতিশীল, মৌলবাদবিরোধী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী সম্মিলনে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজনীতিতে একটি প্রভাবশালী ধারা বিকশিত হতে থাকে।[১৭] মোহাম্মদ আজম উল্লিখিত চতুর্বর্গের সঙ্গে আমি 'মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি' নামক আরেকটি বর্গ যোগ করে আলোচনাটিকে বাংলাদেশের গণমাধ্যম অধ্যয়নে স্থাপন করতে চাই। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজনীতিতে তৈরি হওয়া আধিপত্যশীল এ ধারাটির গঠন ও বিস্তারে শিল্প-সাহিত্য ও বুদ্ধিজীবিতার পাশাপাশি সাংবাদিকতা কিংবা গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। একটি ডিসকোর্স তৈরি করা এবং তা বারংবার তুলে ধরার মধ্য দিয়ে ডিসকোর্সটির স্বাভাবিকীকরণ ও গণগ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অগ্রগণ্য। উদাহরণ হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সক্রিয় শিক্ষক-রাজনীতির একটি প্রধান ধারা যা 'নীল দল' নামে পরিচিত, এর কথাই বলা যাক। নীল দল নিজেদের আত্মপরিচয় নির্মাণ করেছে 'মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি' হিসাবে এবং দেশের সব গণমাধ্যম আনক্রিটিক্যালি তাদের বানানো পরিচয়কে দশকের পর দশক প্রচার করে আসছে যেনবা এখানে 'মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি' নামে আরও এক বা একাধিক দল রয়েছে। গণমাধ্যম প্রকারান্তরে তাদের বানানো বয়ানকে অনুমোদন ও স্বীকৃতি (এনডোর্স অ্যান্ড অ্যাকনলেজ) দিল।

আওয়ামী-সংকীর্ণ লেন্সের বাইরে থেকে মুক্তিযুদ্ধকে বিবেচনা করা হলে 'রাজাকার' ট্যাগ দেওয়া, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও স্বার্থরক্ষার প্রসঙ্গকে রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসাবে বিবেচনা না করে নিছক ভারতবিরোধিতা বা পাকিস্তানপ্রীতি হিসাবে সরলীকরণ, বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ইসলামের বিপরীতে স্থাপন করা, ইসলাম ধর্মের নানান উপাদানকে প্রতিক্রিয়াশীল, মৌলবাদী ও জঙ্গি তকমা দেওয়া প্রভৃতি ছিল বিগত ফ্যাসিস্ট ন্যারেটিভের অংশ। তারা সেক্যুলার, প্রগতিশীল, মৌলবাদবিরোধী, বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি নামের এ পঞ্চবর্গের এমন এক সংকীর্ণ আওয়ামী বয়ান তৈরি করেছে যে, এর বাইরে অবস্থিত সবকিছুই ছিল তাদের বিবেচনায় 'অপর'। ফ্যাসিস্ট রেজিমের এ সংকীর্ণ বয়ানই বাংলাদেশের গণমাধ্যম নির্বিচারে ও প্রশ্নহীনভাবে ব্যবহার করে আসছে দশকের পর দশক। বলা চলে, বাংলাদেশে দলীয় গণমাধ্যম আছে; কিন্তু আওয়ামী ন্যারেটিভের বাইরের গণমাধ্যম খুব একটা নেই। কারণ, আমাদের আধিপত্যশীল বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও সাংস্কৃতিক পাটাতন তৈরি হয়েছে আওয়ামী চৈতন্যে। ফলে গণমাধ্যম মালিকানা ও পরিচালনায় আওয়ামী লীগ না থাকলেও তাদের চৈতন্যের প্রতিফলন ঘটছে অ-আওয়ামী লীগারদের হাতে। সুতরাং, ফ্যাসিস্ট গণমাধ্যম সৃষ্ট এবং সেক্যুলার, প্রগতিশীল, মৌলবাদবিরোধী, বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি এর আধিপত্যশীল বয়ানকে চ্যালেঞ্জ করা এবং এর পালটা বয়ান নির্মাণ করা জরুরি প্রজেক্ট হিসাবে সাব্যস্ত হওয়া দরকার।

> একদলীয় শাসনব্যবস্থা সুসংহত করার স্বার্থে বিগত অনির্বাচিত সরকারকে বিচিত্র ধরনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বয়ান নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করতে হয়েছে। এসব বয়ান উৎপাদন, পুনরুৎপাদন, বিস্তার ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার বিশ্বস্ত দায়িত্বে ছিল সরকারের মদতপুষ্ট গণমাধ্যম ও বশংবদ সাংবাদিককুল

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অপতথ্যের বিস্তার

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে-পরে আওয়ামী লীগের পক্ষে বিভিন্ন গণমাধ্যম ও বিরোধী দলের ফেসবুক পেজে নানা মন্তব্য করা হয়েছে ফেক ফেসবুক প্রোফাইল থেকে। ১ হাজার ৩৬৯টি ফেসবুক প্রোফাইল থেকে আওয়ামী লীগের পক্ষে ১৯৭টি পোস্টে সমন্বিতভাবে ২১ হাজারের বেশি মন্তব্য করা হয়েছে একটি বট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে।[১৮]

সংকটকালে বিগত সরকার ও তার গোয়েন্দা সংস্থা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মিথ্যা, গুজব, অসত্য বা আংশিক সত্য তথ্য প্রচার করতে দেখা গেছে। জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরানো কিংবা বিভ্রান্তি তৈরি করাই ছিল সরকারের উদ্দেশ্য। এসব অপতথ্য প্রচারে সোশ্যাল

মিডিয়ার পাশাপাশি দেশের প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যমকে অংশ নিতে দেখা গেছে। যেমন: জুলাই-আন্দোলনের শেষদিকে, ৩ আগস্ট রাত ১২টার পর সোশ্যাল মিডিয়া দখলে ছিল সরকার ও গোয়েন্দা সংস্থা নিয়োজিত বট নেটওয়ার্কের হাতে। দেশের গণমাধ্যমগুলো সরকার প্রযোজিত সেই অপতথ্যকে জাতির সামনে উন্মোচন না করে বরং তা পুনরুৎপাদন করে গেছে নিজেদের প্রচারমাধ্যমে। জুলাই-আন্দোলনে দর্শক-শ্রোতা-পাঠক যখন প্রতিমুহূর্তে সঠিক তথ্যের জন্য দেশের ৩০টি টেলিভিশন চ্যানেল ও সহস্রাধিক সংবাদপত্রের দিকে তাকিয়ে ছিল, তখন বেশির ভাগ গণমাধ্যম সরকার ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার প্রেসক্রিপশন ও প্রেসনোট অনুযায়ী কখনো অর্ধসত্য, কখনো অসত্য সংবাদ পরিবেশন করে গেছে। ২০২১ সালে সুইডেনভিত্তিক 'নেত্র নিউজ' থেকে 'অল দ্য প্রাইম মিনিস্টারস মেন' নামে একটি ডকুমেন্টারিতে বিগত সরকার ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কিত বিভিন্ন গোপন তথ্য ফাঁস করা হলে ওই ডকুমেন্টারির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুজন সাংবাদিকের (জুলকারনাইন সায়ের ও তাসনিম খলিল) চরিত্রহননের জন্য অপতথ্য ছড়াতে থাকে বিগত সরকার ও তাদের গবেষণা সংস্থা 'সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই)'। তাসনিম খলিল সম্পর্কে প্রচার করা হয় তিনি একজন সমকামী এবং জুলকারনাইন সায়ের সম্পর্কে প্রচার করা হয় যে তিনি বহুনারীতে আসক্ত, যিনি ১০টি গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। একটি সূত্র বলছে, সরকারের সেই প্রোপাগান্ডার অংশ হিসাবে এসব অপতথ্য ছড়াতে ২০২১ সালে ৩ হাজারেরও বেশি পোস্ট দেওয়া হয় ফেসবুকে।[১৯]

ঘর থেকে আয়নাঘর

দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে বিগত সরকার গণবিরোধী একটি গণমাধ্যম কাঠামো গড়ে তুলেছে। সরকারি কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকেও গণমাধ্যমের ভেতর-বাইরে থাকা কোনো কোনো সাংবাদিক ও অধিকারকর্মীকে ক্ষমতাকাঠামোকে প্রশ্ন করতে দেখা গেছে। প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকে কিছুটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চালিয়ে গেছেন কেউ কেউ। সুতরাং আমরা যেন প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণমাধ্যমটির সমালোচনা করতে গিয়ে সেখানে কর্মরত সব সাংবাদিকের ভূমিকাকে একাকার করে না ফেলি। প্রলোভন বা ভয় দেখিয়ে যাদের কাবু করা যায়নি–এমন সাংবাদিকদের অনেককে নিজ ঘর থেকে আয়নাঘরে যেতে হয়েছে। গুম, খুন, নির্যাতন, মামলা, চাকিরচ্যুতি, দেশত্যাগ প্রভৃতি ছিল অনেক সাংবাদিকের নিয়তি! আইন ও সালিশ কেন্দ্রের ২০২২ সালের এক প্রতিবেদনমতে, ১০ বছরে (২০১২-২২) বাংলাদেশে ৩০ জন সাংবাদিক গুম হয়েছেন। বেপথু সাংবাদিক ও বিরোধীপক্ষের কর্মকাণ্ড (অপকর্ম!) নজরদারি করার জন্য সরকার ইসরায়েল থেকে প্রযুক্তি ক্রয় করেছে![২০] চ্যানেলগুলোয় অতিথি হিসাবে কারা আসবেন কিংবা আসতে পারবেন না, সংবাদপত্রে কারা কলাম লিখতে পারবেন কিংবা পারবেন না প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ ছিল সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার হাতে। বিরোধী পক্ষের অতিথিদের টকশো প্রচারের আগে কখনো কখনো এর রেকর্ডিং গোয়েন্দা সংস্থার টেবিল ঘুরে আসতে হতো। বিভিন্ন গণমাধ্যমের ওপর সরকারি-বেসরকারি বিজ্ঞাপন না দেওয়ার নিষেধাজ্ঞাও ছিল গোয়েন্দা সংস্থার হাতে। স্বাধীন গণমাধ্যমের জন্য গোয়েন্দা সংস্থা নির্দেশনায় গণমাধ্যম চালানো চিরতরে বন্ধ করতে হবে। গণমাধ্যম মনিটরিং-এর জন্য গোয়েন্দা সংস্থার কাছে থাকা প্রযুক্তি প্রস্তাবিত গণমাধ্যম কমিশনের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

গণমাধ্যম রাষ্ট্র তথা রাজনৈতিক দলের মতাদর্শিক হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। লুই আলথুসারের বরাতে তা আমরা কমবেশি অবগত। বিগত সরকারপ্রধানের প্রেস কনফারেন্স কীভাবে প্রেইজ কনফারেন্সে রূপ নিয়েছিল, আমরা তা দেখেছি। গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করা শাসকদলের হেজিমনি/আধিপত্য তৈরির অংশ। একটি রাষ্ট্রের ধরন বা চরিত্রের ওপর নির্ভর করে সে রাষ্ট্রে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা ও বিধিবিধান কেমন হবে। স্বৈরতান্ত্রিক, ফ্যাসিবাদী ও একদলীয় শাসন স্বাধীন গণমাধ্যমের পরিপন্থি। যদি রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা না থাকে এবং রাষ্ট্র পরিচালনাকারীরা একদলীয় নীতির বাস্তবায়ন চান, তবে গণমাধ্যমের ক্ষেত্রেও এর প্রতিফলন ঘটবে। সুতরাং স্বাধীন গণমাধ্যমের পূর্বশর্ত হচ্ছে গণতন্ত্র। বহুত্ববাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতিই স্বাধীন গণমাধ্যমের মৌলিক ভিত্তি।

তথ্যসূত্র

১. আলী রীয়াজ ও মোহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমান (২০২১)। *বাংলাদেশের মিডিয়া জগতের মালিক কারা?* সেন্টার ফর গর্ভনেন্স স্টাডিজ।
২. নাহিদ ইসলাম (৭ অক্টোবর ২০১৪)। 'সম্পাদক ও মালিকরাই ওয়েজবোর্ডের বিরোধিতা করেন'। জাতীয় প্রেস ক্লাব। লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=PO58QSGJ7ws
৩. আনিস রহমান (২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪)। নতুন সময়ে যোগাযোগ নীতির সংস্কার, টেকসই ও মুক্ত গণমাধ্যমের খোঁজে, বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্কলার ইন নর্থ আমেরিকা আয়োজিত সেমিনার। লিংক: https://www.facebook.com/events/1672286956961122/
৪. আশরাফ কায়সার (২০ অক্টোবর ২০২৪, বাংলাভিশন), শেখ হাসিনার প্রেস কনফারেন্সে সাংবাদিকদের প্রশ্ন শুনে মানুষ হাসাহাসি করত। লিংক: https://youtu.be/GUrsuz3vMDQ?si=44-tf1cZrO2LZRQ9
৫. আলী রীয়াজ ও সাজ্জাদুর রহমান, ২০২১
৬. আলী রীয়াজ ও সাজ্জাদুর রহমান, ২০২১
৭. আশরাফ কায়সার, ২০ অক্টোবর ২০২৪, বাংলাভিশন
৮. আনিস রহমান, ২০২৪
৯. রিয়াদুল করিম (২০ অক্টোবর ২০২৪)। সংবাদপত্র ও প্রচারসংখ্যা নিয়ে ডিএফপির অবিশ্বাস্য তথ্য। *প্রথম আলো*।
১০. নূরুল কবীর (২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪)। নতুন সময়ে যোগাযোগ নীতির সংস্কার, টেকসই ও মুক্ত গণমাধ্যমের খোঁজে, বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্কলার ইন নর্থ আমেরিকা আয়োজিত সেমিনার। লিংক: https://www.facebook.com/events/1672286956961122/
১১. নূরুল কবীর, ২০২৪
১২. আব্দুর নূর তুষার (১২ অক্টোবর ২০২৪)। মানুষের পদে ব্রডকাস্ট মিডিয়া, মিডিয়া সংস্কার আলোচনা। পাঠশালা সাউথ এশিয়ান মিডিয়া ইনস্টিটিউট। wjsK: https://fb.watch/vreyuvyQP /
১৩. আশরাফ কায়সার (১২ অক্টোবর ২০২৪)। মানুষের পক্ষে ব্রডকাস্ট মিডিয়া, মিডিয়া সংস্কার আলোচনা। পাঠশালা সাউথ এশিয়ান মিডিয়া ইনস্টিটিউট। লিংক: https://fb.watch/vreyuvyQP/
১৪. আ-আল মামুন (২৯ ডিসেম্বর ২০২২)। বাংলাদেশে শিকারি সাংবাদিকতার উত্থানপর্ব। দৃক গ্যালারি। লিংক: https://youtu.be/Au0GLYp1eZ4?si=hniLnGPsdxK0I-IC
১৫. আলী রীয়াজ ও সাজ্জাদুর রহমান, ২০২১
১৬. মোহাম্মদ আজম (১৬ অক্টোবর, ২০২৪) বাংলাদেশের ইতিহাস, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পটভূমিতে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ২০২৪, *জনপরিসর আয়োজিত সেমিনার*, মুজাফফর আহমদ মিলনায়তন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৭. মোহাম্মদ আজম, ২০২৪
১৮. সামছুর রহমান (২৯ আগস্ট ২০২৪)। মানুষ নয়, আওয়ামী লীগের পক্ষে ফেসবুকে মন্তব্য করেছিল 'বট'। প্রথম আলো। লিংক: https://www.prothomalo.com/politics/obsi0syu4g
১৯. কদরুদ্দিন শিশির (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)। বাংলাদেশ গর্ভনমেন্টস ডাবল স্ট্যান্ডার্ডস ইন ডিলিং উইথ ফেক নিউজ। ANFRELI লিংক: https://anfrel.org/bangladesh-govts-double-standards-in-dealing-with-fake-news/
২০. অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স মেন (২০১১)। *আলজাজিরা*। অনুসন্ধানী ডকুমেন্টারি মুভি। লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=a6vlevbUN4

ফাহমিদুল হক

নিপীড়নবিরোধিতা থেকে গণ-অভ্যুত্থান

দেড় দশকে বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতার রূপ

২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানকে বলা হয় ছাত্র-জনতার আন্দোলন। জনতার ব্যাপক অংশগ্রহণে শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটে। এর শুরু বিশ্ববিদ্যালয়ে, এর মূল নেতৃত্ব শিক্ষার্থীদের হাতেই ছিল। কিন্তু মোটের ওপরে কেমন ছিল দেড় দশকের শিক্ষাঙ্গন-পরিস্থিতি? বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতা বা একাডেমিক ফ্রিডমের কী পরিস্থিতি ছিল? শিক্ষক ও ছাত্ররাজনীতির ধরন কেমন ছিল? প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মাত্রা কেমন ছিল? এ প্রবন্ধে সেসব নিয়ে আলোচনা করা হবে।

স্বৈরাচারী সময়ে বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতা প্রায় কেড়েই নেওয়া হয়েছিল। একজন শিক্ষক ক্লাসে কী বললেন, পত্রিকায় বা ফেসবুকে কী লিখলেন, তাঁকে এর ফল ভোগ করতে হতো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বা সরকারের সমালোচনা করার কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মাইদুল ইসলামের বিরুদ্ধে আইসিটি অ্যাক্টের ৫৭ ধারায় মামলা করেছেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য। মাইদুলকে কারাভোগ করতে হয়েছে। এক মন্ত্রীর মৃত্যুকে ঘিরে ফেসবুকে লেখার কারণে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সিরাজুম মুনীরার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়, কারাভোগ করেন তিনি। সরকার এবং বিভাগের শিক্ষকদের অনিয়ম নিয়ে লেখার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রুশাদ ফরীদিকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়। এরকম বহু উদাহরণ সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই দেওয়া যাবে। চিন্তার স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত এবং ভীতি সঞ্চার করেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে বিগত সরকার। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, বহু স্কুল-কলেজের শিক্ষকের একই দশা দেখা গেছে। সরকারের হয়ে ক্যাম্পাসে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও ভীতি সঞ্চারের কাজ করতো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, সরকারি শিক্ষক গ্রুপ ও ছাত্রলীগ। তাদের প্রয়োজনে ক্যাম্পাসে পুলিশ ডাকা হয়েছে।

২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে শত শত মামলা হয়েছে। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন যাঁরা, তাঁদের কারাবরণ করতে হয়েছে। একই বছর নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের কিশোর-তরুণরা ব্যাপকভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছে ছাত্রলীগ ও পুলিশবাহিনীর হাতে। ২০১৮ সালের দুই আন্দোলনই সফলতার মুখ দেখতে ব্যর্থ হয়েছে কঠোর ও নির্মম

লেখক: সাবেক শিক্ষক, ঢা.বি. এবং বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যাপনারত

নিবর্তনের কারণে। কিন্তু প্রথমদিককার আন্দোলন ব্যর্থ হলেও এর প্রেরণা ও উদ্দীপনা মরে যায় না। ২০১৮ সালে ব্যর্থ কোটা সংস্কার আন্দোলন ২০২৪ সালে এসে সফল হয়। কেবল দাবিই অর্জিত হয়নি, সরকারের পতন ঘটিয়ে দিয়েছে। তবে বহু রক্তপাত ও ত্যাগ স্বীকার করেই কেবল গণ-অভ্যুত্থান সফল হয়েছে। ২০২৪ সালেও আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া সমন্বয়কদেয় দফায় দফায় গুম-গ্রেফতার করা হয়েছে। অভ্যুত্থানে অংশ নিয়ে মারা গেছেন প্রায় দেড় হাজার মানুষ, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কমবয়েসি ছাত্র। আহত হয়েছেন কত শিক্ষার্থী! হাত-পা-চোখ হারিয়েছেন কতজন! আজও মাঝেমধ্যেই শোনা যায় আন্দোলনে আহতদের মৃত্যুর খবর।

তবে প্রথম কয়েক বছরে আন্দোলন দানা না বাঁধলেও প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের ধারা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। প্রশাসন ও ছাত্রলীগের নিপীড়নের বিরুদ্ধে 'নিপীড়নবিরোধী শিক্ষার্থী'রা সক্রিয় ছিল। প্রথমদিকে বাম-প্রগতিশীল জোট এবং পরের দিকে গণ-অধিকার পরিষদ কিংবা ছাত্র শক্তি প্রভৃতি নানান রাজনৈতিক শক্তির পাশাপাশি মুক্তিকামী সাধারণ শিক্ষার্থীরা এ প্রতিরোধ আন্দোলনে নানানভাবে যুক্ত ছিল। তেমনই ছিলেন 'নিপীড়নবিরোধী শিক্ষক'রাও। বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের ভূমিকার কথা এখানে বিশেষভাবে আলোচিত হবে। তবে এর আগে দেড় দশকের শিক্ষকরাজনীতি ও ছাত্ররাজনীতির একটা পর্যালোচনা করা যাক।

শিক্ষক ও ছাত্ররাজনীতি

প্রায় ২২ বছর বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে আমি এটি বুঝেছি, শিক্ষকরা রাজনীতি করেন প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে নানান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য। রাজনীতি করলে তরুণ শিক্ষক হাউজ টিউটর বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রক্টর হতে পারবেন। সে সুবাদে কম ভাড়ায় বাসা পাবেন। এ বিষয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য, যেহেতু ঢাকা শহরে বসবাস করতে গেলে আয়ের প্রধান অংশটি ব্যয় করতে হয় বাসা ভাড়াতেই। রাজনীতি করলে কেবল প্রমোশন নির্বিঘ্ন হবে না, যোগ্যতার কিছু ঘাটতিসহই প্রমোশন হবে। যাঁরা একটু সিনিয়র হন; তাঁরা প্রভোস্ট, শিক্ষক সমিতির পদে জয়ী, ডিন, সিন্ডিকেট বা সিনেট সদস্য হতে চান। আর রাষ্ট্রীয় নানান কমিশন, ইনস্টিটিউট প্রভৃতি তো রয়েছেই। আগে রাজনীতিকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন পরামর্শের জন্য আর এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা রাজনীতিকদের কাছে গিয়ে ধরনা দেন নানান সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য। নানান ধান্দায় তাঁরা সচিবালয়েও ঘোরাঘুরি করেন।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েই বাংলাদেশকে বুঝতে পারতাম। একজন ১৫ বছর ধরে স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় যেমন দেশ পরিচালনা করেন, তেমনই একেকজন উপাচর্যও একেকজন স্বৈরাচারে পরিণত হন। রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ের মানুষটি স্বৈরাচারী হয়ে উঠলে তাঁর প্রভাব অন্যত্র পড়ে। সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রধানও স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন। একজন উপাচার্য, একজন একাডেমির প্রধান, বিসিবির প্রেসিডেন্ট প্রমুখ ব্যক্তিও স্বৈরাচারী নীতিতে চলতে চান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে দেখেছি প্রায়ই সিন্ডিকেট সভায় একে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠিয়ে দেন, তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। অথচ তিয়াত্তরের অধ্যাদেশে বলা আছে, কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ এলে তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। গঠিত তদন্ত কমিটিতে সে বিষয়ে শুনানি হবে। এসব কিছু করা হতো না। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁদের অনেকেই হাইকোর্টে মামলা করে রায় নিজের পক্ষে নিতে পেরেছেন। কারণ, শাস্তি দেওয়ার আগে নিয়ম মেনে বিচারগুলো করা হয়নি। এ কারণে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির কিছু জেনুইন কেস পার পেয়ে গেছে। হাইকোর্টে কোনো মামলা গেলেই বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণত হেরে যায়। অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের কিছু কিছু জিনিস আর অনুসরণ করেননি। কিন্তু তিনি প্রশাসনকে আরও এককেন্দ্রিক করে তোলেন। যেসব চিঠিপত্রের প্রক্রিয়া উপাচার্য টেবিল ছাড়াই সমাপ্ত হতে পারত, সেগুলোকেও তিনি তাঁর টেবিলে আনতে বাধ্য করেন। যেমন: শিক্ষকদের কোনো ছুটিছাঁটার আবেদনপত্র উদ্ধার করতেও উপাচার্যের সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে হতো।

অন্যদিকে জাতীয় পর্যায়ে যেমন সরকার ফ্যাসিবাদী কায়দায় বিরোধী দল বা বিএনপি-জামায়াতকে নিপীড়ন করে ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিল, তেমনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও নীল দলের শিক্ষকরা মিলে বিএনপি-জামায়াতপন্থি সাদা দলের শিক্ষকদের শিক্ষকরাজনীতিতে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছিল। রাজনীতি বাদ দিয়ে শিক্ষকরা ঘরে ঢুকে যান বা অন্যকিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ক্যাম্পাসে যে কত বড়ো বড়ো ইস্যু গেছে, তাঁরা সেই সূত্রে সক্রিয় হতে পারতেন, তাঁরা তা করেননি। যেহেতু তাঁরা সুবিধাবঞ্চিত বহু বছর, তাই তাঁরা আর মাঠে নেই। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনাদশেক শিক্ষক প্রথমে নিপীড়নবিরোধী শিক্ষক এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক ব্যানারে এসব অনিয়ম-নিপীড়নের প্রতিবাদ করতাম। কোনো কোনো আন্দোলন কিছুটা জোরদার হলে আমি ফোন পেয়েছি সাদা দলের নেতার কাছ থেকে, 'আমরা কি আপনাদের সমাবেশে আসব?' অথচ তাঁদের দলে সদস্যসংখ্যা তিন-চার শ। আমরা ১০ জনে যা করতে পারছিলাম, তাঁরা চাইলে এর বহুগুণ জোরদার আন্দোলন করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের সেই সক্রিয়তা নির্বাপিত। কারণ, সুযোগ-সুবিধার স্রোত বন্ধ হয়ে রাজনীতির নদীতে চড়া পড়েছে। তাই আমার ওই অনুসিদ্ধান্ত পুনর্ব্যক্ত করছি–শিক্ষকরা রাজনীতি করেন পদ-পদবি ও সুযোগ-সুবিধার জন্য। আদর্শ এখানে গৌণ। কথাটা ছাত্ররাজনীতির ক্ষেত্রেও সত্য। আজ আবার ক্ষমতার পালাবদলের পর সাদা দলের শিক্ষকরা ধরে নিয়েছেন, নীল দলের অনুপস্থিতিতে তাঁরাই নানান পদবির দাবিদার। নানান পদ তাঁরা পেয়েছেনও। এর আগে পদবির জন্য দৌড়াদৌড়িও করেছেন। সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, '৫০০ শিক্ষক উপাচার্য হতে চান, পড়াতে চান না।' কথাটির মধ্যে অতিশয়োক্তি থাকতে পারে, তবে এর মধ্য দিয়ে একটা প্রবণতা স্পষ্ট হয়, আর তা হলো–শিক্ষকরা উপাচার্য, উপ-উপাচার্য হওয়ার জন্য দৌড়ঝাঁপ করেছেন।

ছাত্ররাজনীতির অবস্থা আরও করুণ ছিল। ছাত্রাবাসগুলো কেবল নয়, পুরো ক্যাম্পাসই ছাত্রলীগের দখলে ছিল। বাম সংগঠনগুলো রাজনীতি করতে পারলেও ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির ক্যাম্পাসগুলোয় একরকম নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য নব্বইয়ের অভ্যুত্থানের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছাত্র এবং সব ছাত্র সংগঠনের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ছাত্রশিবির ১৯৯১ সাল থেকেই নিষিদ্ধ ছিল ক্যাম্পাসে। ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর অবশ্য জানা গেছে, আন্দোলনের সমন্বয়কের রূপে, এমনকি ছাত্রলীগরূপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবির সক্রিয় ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগের আমলজুড়ে ছাত্রলীগের এত দৌরাত্ম্য ছিল যে, ছাত্রাবাসগুলোয় প্রভোস্ট ও হাউজ টিউটর থাকলেও ছাত্রলীগই কার্যত হল প্রশাসন চালাত। তারাই নতুন ছাত্রদের হলে ওঠাত, গণরুমে রাখত, মিছিলে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ে যেত। গেস্টরুমে ছাত্রদের আদবকায়দা

তিন সমন্বয়কের খোঁজে ২৭ জুলাই ডিবি কার্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের ১২ জনের প্রতিনিধিদল
ছবি: ইব্রাহিম খলিল ইবু/স্টার

শেখাত। 'গেস্টরুম কালচার'-এর বলি হয়ে হলের শিক্ষার্থীদের যাপন করতে হয় প্রায় এক রেজিমেন্টেড জীবন। তারুণ্যকে মহা-অনিচ্ছুকের এক জীবনযাপন করতে হয়, এর চেয়ে বেদনার আর কী আছে! তারুণ্য হয় বাঁধনহারা, কথা না শোনার বয়স এটা। কিন্তু তাকে অনিচ্ছাসহ চলতে হয় অন্যের কথায়। আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি, হলের যে জীবন, তাতে কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর সেল্‌ফ ডিগনিটি অবশিষ্ট থাকে না। একেকজন হলবাসী হলো পরাস্ত, পরজীবী একেকটি প্রাণী। ছাত্রলীগের মিনি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলোয় অত্যাচারিত হয়ে নীরবে কেঁদেছে কত অসহায় শিক্ষার্থী। ঝরে গেছে আবরার বা আবু বকরের মতো কত প্রাণ।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক এখন একটি পরিচিত শিক্ষক সংগঠনের নাম। তবে সংগঠনটি ১০ বছরের পুরোনো। আমি ছিলাম এর প্রতিষ্ঠাকালীন এবং অন্যতম সক্রিয় সদস্য। বিদেশে চলে এলেও সক্রিয়তা একটুও কমেনি আমার জন্য।

২০১৪ সালের ৯ মার্চ গঠিত হয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক (পিইউটিএন)। চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ জন শিক্ষকের উপস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সভার মধ্য দিয়ে এ নেটওয়ার্কটি আত্মপ্রকাশ করে। আর এ নেটওয়ার্কটি গঠিত হওয়ার পেছনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্য কোর্সবিরোধী আন্দোলনের একটি প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। ২০১৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি শিক্ষার্থীদের ওপর সহিংসতার পর দেশব্যাপী নানান সমালোচনা ও প্রতিবাদ চলছিল। আমরা শিক্ষকরা এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কী করতে পারি, তা নিয়ে ফেসবুকের একটি ইনবক্স থ্রেডে আলোচনা শুরু করি। পরে জন্ম হয় নেটওয়ার্কটির। দুটি লক্ষ্য স্থির করে নেটওয়ার্কটি গঠিত হয়েছিল:

১. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণের তথা শিক্ষার পণ্যায়নের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা; এবং ২. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার গবেষণা ও বিশ্লেষণভিত্তিক ক্রিটিক তৈরি করা এবং বিকল্প প্রস্তাব/রূপরেখা প্রণয়ন করা। এ লক্ষ্যে গবেষণা, সেমিনার, কনভেনশন, সিম্পোজিয়াম, প্রকাশনা, অ্যাক্টিভিজম, নেটওয়ার্কিংসহ নানান উপায়ে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখা।

তবে নানান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমন্বয় করে কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন হচ্ছিল। তবু এ নেটওয়ার্ক থেকে কিছু যৌথ লেখা, যৌথ বিবৃতি প্রকাশ হয় বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত বিষয়েই। তবে পিইউটিএন ব্যর্থ হয়। ঘোষণা দেওয়া হয়নি; কিন্তু আমরা জানি এটি এখন বিলুপ্ত। পিইউটিএন ব্যর্থ হলেও এর ধারণা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। ফলে পিইউটিএন-এর সঙ্গে যুক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এবার গঠন করলেন আইটিএন বা ইনডিপেনডেন্ট টিচার্স নেটওয়ার্ক। এর আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একই নামের একটি সংগঠন সক্রিয় ছিল। নেটওয়ার্ক শব্দটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেটওয়ার্কটি ২০১৭ সালের মার্চে গঠিত হয়। প্রায় ২০ জন শিক্ষককে নিয়ে এর কার্যক্রম শুরু হয়, তবে এর নিয়মিত সদস্য ছিলেন কমবেশি ১০ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইস্যুতে যৌথ লেখা বা বিবৃতির পাশাপাশি তিনটি প্রকল্প নিয়ে নেটওয়ার্কটি কাজ করা শুরু করে। এ প্রকল্পগুলো প্রচলিত অর্থে 'অরাজনৈতিক' ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নসংক্রান্ত। একটি হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের অটোমেশন। দ্বিতীয়টি হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার সংস্কার। তৃতীয়টি হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পরিচ্ছন্নতা। ভর্তি পরীক্ষায় সংস্কার কর্মসূচিটি সফল হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিনের উদ্যোগের ফলে ভর্তি পরীক্ষায় এমসিকিউ-এর সঙ্গে লিখিত অংশ যুক্ত হয়, সত্যিকারের মেধাবী শিক্ষার্থী যাচাইয়ের জন্য, যা কেবল এমসিকিউ-এর মাধ্যমে যাচাই সম্ভব হয়ে ওঠে না।

আমাদের এসব তৎপরতা অব্যাহত রাখতে সংগঠনের নাম চূড়ান্ত করতে একটু সময় লাগে। ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের নিপীড়ন বেড়ে যাওয়ায় 'নিপীড়নবিরোধী শিক্ষক' নামে অনেক কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। শেষে সারা দেশের সব ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য (স্বায়ত্তশাসিত পাবলিক, অস্বায়ত্তশাসিত পাবলিক ও বেসরকারি) নাম চূড়ান্ত হয় 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক'। বৈশ্বিক কানেকটিভিটির সময়ে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত আগ্রহী শিক্ষকরাও নেটওয়ার্কে যুক্ত হন। আমি নিজেই সেরকম একজন। ফেসবুকে নেটওয়ার্কের যে ক্লোজড গ্রুপ আছে, এর সদস্যসংখ্যা প্রায় ৩০০ জন। যদিও অনুমান করা যায়, সবাই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে

সমানভাবে বিশ্বাসী নন। সবার জন্য উন্মুক্ত একটি পেজ আছে, যার সদস্যসংখ্যা ১০ হাজারের মতো। সক্রিয় সদস্যদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশি। বিভাগ অনুযায়ী সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ থাকে নৃবিজ্ঞানের, এরপর গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের। সক্রিয়দের মধ্যে মাঝবয়সি ও সিনিয়রদের সংখ্যাই বেশি। আমরা নতুনদের খুব বেশি সংখ্যায় যুক্ত করতে পারিনি। এটি অবশ্যই একটা ব্যর্থতা। তবে সম্প্রতি নানান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নতুনদের একটি গ্রুপ যুক্ত হয়েছে এবং সংগঠনে প্রাণসঞ্চার হয়েছে।

একসময় শিক্ষক নেটওয়ার্ক কাজ করত কোনো কিছু ঘটলে, এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে–বিবৃতি দিয়ে, মিছিল-সমাবেশ করে, পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখে। শিক্ষকরা তাঁদের পেশাগত, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নানান দায়িত্ব পালনের পরই কেবল নেটওয়ার্কের জন্য সময় বের করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের ওপর নিপীড়ন হলে বা শিক্ষকদের ওপর নানান নিবর্তন শুরু হলে নেটওয়ার্ক তাঁদের পাশে দাঁড়ায়। সাম্প্রতিক কোটা সংস্কার ও পরবর্তী বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নেটওয়ার্কের ভূমিকা প্রথমবার সারা দেশের মানুষের চোখে পড়ে। তবে শিক্ষক নেটওয়ার্ক এ ধরনের কাজ এক দশক ধরেই করে চলেছে। এ দফায় নেটওয়ার্ক কেবল সক্রিয়ই ছিল না, আন্দোলনের এক অংশীদারও হয়ে ওঠে।

শিক্ষার্থীদের ওপর নিপীড়ন হলে বা শিক্ষকদের ওপর নানান নিবর্তন শুরু হলে নেটওয়ার্ক তাঁদের পাশে দাঁড়ায়। সাম্প্রতিক কোটা সংস্কার ও পরবর্তী বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নেটওয়ার্কের ভূমিকা প্রথমবার সারা দেশের মানুষের চোখে পড়ে। তবে শিক্ষক নেটওয়ার্ক এ ধরনের কাজ এক দশক ধরেই করে চলেছে। এ দফায় নেটওয়ার্ক কেবল সক্রিয়ই ছিল না, আন্দোলনের এক অংশীদারও হয়ে ওঠে

নেটওয়ার্কের অল্প কজন 'প্রতিক্রিয়া' দেখালে ক্ষমতাবানরাও তাতে যথেষ্ট পালটা প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। নেটওয়ার্কের শিক্ষকদের প্রায় সবাইকে নানান প্রতিকূলতা ও বঞ্চনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এতে যুক্ত বেশির ভাগেরই ভালো-নিয়মানুবর্তী শিক্ষক ও নিবিষ্ট গবেষক হিসাবে সুনাম রয়েছে। কিন্তু কারোরই প্রমোশন বা অন্য স্বাভাবিক বিষয়গুলো মসৃণ উপায়ে হয়নি। একটি কথা বলতে হবে, নেটওয়ার্কের কর্মকাণ্ড বিষয়ে মিডিয়া থেকে সবসময়ই ভালো সাড়া পাওয়া গেছে। চারিদিকের বিপুল সরকারি ভাষ্যের বিপরীতে নেটওয়ার্কের কার্যকলাপ একটা দ্বান্দ্বিক বাস্তবতাকে হাজির করত, যা মিডিয়ার শিক্ষক-ছাত্র হিসাবে জানি, মিডিয়ার গ্রহণযোগ্যতা ও কাটতির জন্য ভালো উপাদান। নেটওয়ার্ক যেহেতু সাধারণ্যের পক্ষে কথা বলে এবং সাধারণই হলো মিডিয়ার পাঠক-দর্শক, তাই মিডিয়াকে সবসময় পাশেই পাওয়া গেছে।

আপনাদের পুরোনো একটি ঘটনা হয়তো মনে পড়তে পারে, ২০১৮ সালের ডাকসু নির্বাচনের শুরুতেই কারচুপির ঘটনা ঘটে কুয়েত-মৈত্রী হলে। আমাদের আটজনের একটি দল নির্বাচনে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করি এবং মিডিয়ায় রিপোর্ট দিই, 'নির্বাচন সর্বাঙ্গীণ সুষ্ঠু হয়নি'। এ কারণেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্বাচনটি সুষ্ঠু হিসাবে বের করে নিয়ে আসতে ব্যর্থ হয় এবং তাঁরা আমাদের ওপর অনেক গোস্‌সা হন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক সময়ের। ২০২১ সালে প্রণীত শিক্ষাক্রম ২০২৩ সাল নাগাদ প্রয়োগ শুরু হলে একে ঘিরে অনেক তর্কবিতর্ক শুরু হয়। শিক্ষক নেটওয়ার্ক থেকে একটি উন্মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা হয় ২০২৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর। 'শিক্ষাক্রম ২০২১: আমরা কেন উদ্‌বিগ্ন' শিরোনামের ওই আলোচনাসভাটি শুরুর ঘণ্টাখানেক আগে বাতিল করা হয়। আরসি মজুমদার মিলনায়তনের দরজা খোলাই হয়নি। ফলে নেটওয়ার্কের সদস্যরা অপরাজেয় বাংলার সামনে গিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সংগঠনের অনুষ্ঠান বাতিল করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, অকল্পনীয় ব্যাপার!

এক দশক ধরেই নেটওয়ার্ক কাজ করেছে প্রবল ক্ষমতাবান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষগুলোর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে। অল্প কজন শিক্ষক নৈতিক মনোবল ও শিক্ষার্থীদের সমর্থন নিয়ে আমরা এগিয়ে গেছি। তা ছিল খানিকটা জনগুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়ে এলেও জনগণের হাজিরা ছাড়াই ফাঁকা-নির্জন ময়দানে একা একা চ্যাচামেচির মতো। অন্তত ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পূর্বপর্যন্ত ব্যাপারটি সেরকমই ছিল।

গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪-এ শিক্ষক নেটওয়ার্ক

জুন থেকে শুরু হলেও ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন গতি পায় ১৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনকারীদের পরোক্ষভাবে 'রাজাকারের নাতিপুতি' বলায়। ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময়ও কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী আন্দোলনকারীদের 'রাজাকারের বাচ্চা' অভিধা দিয়েছিলেন। যৌক্তিক দাবির প্রতি কর্ণপাত না করা এবং আন্দোলনকারীদের যা-তা বলা স্বৈরাচারী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। এ মানসিকতা শেখ হাসিনার সরকার বছরের পর বছর প্রদর্শন করে আসছিল। তাই ১৪ জুলাই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা হল থেকে রাস্তায় নেমে আসেন 'তুমি কে আমি কে, রাজাকার-রাজাকার; কে বলেছে, কে বলেছে, স্বৈরাচার-স্বৈরাচার' স্লোগান নিয়ে। পরদিন সকাল থেকেই আন্দোলন বড়ো হতে থাকে, আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা করে ছাত্রলীগ ও পুলিশ। সারা দেশে ৬ জন শিক্ষার্থী নিহত হন। শিক্ষার্থীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ছাত্রলীগকে ক্যাম্পাসছাড়া করে। এরপর সরকার ছাত্রাবাসগুলো বন্ধ ঘোষণা করে, ১৬ জুলাই রাতের মধ্যে জোর করে হল খালি করে দেওয়া হয়। শিক্ষক নেটওয়ার্কের শিক্ষকরা ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অপ্রস্তুত শিক্ষার্থীদের খোঁজখবর নিতে থাকেন, তাঁদের মানসিক সমর্থন দেন, নৈতিক সাহস দেন। হল খালি করে দেওয়ার পর মনে হচ্ছিল, বরাবরের মতোই বলপ্রয়োগ করে সরকার আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলবে। পরদিন ১৭ জুলাই শিক্ষক নেটওয়ার্ক অপরাজেয় বাংলায় নিপীড়নবিরোধী শিক্ষক ব্যানারে এক সমাবেশের আয়োজন করে। তাতে অনেক শিক্ষক যোগ দেন। শিক্ষকরা শিক্ষার্থী হত্যা ও ক্যাম্পাস বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানান।

ওই সমাবেশ থমথমে অবস্থা থেকে আন্দোলনকে মুক্তি দেয়। ওদিকে ছয় শিক্ষার্থী হত্যার প্রতিবাদে বাড্ডা-মহাখালী-বনানী-বারিধারা অঞ্চলের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁদের ওপর পুলিশ নিষ্ঠুর হামলা করে, নিহত হন বেশকিছু শিক্ষার্থী। এবার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগ দেন সাধারণ জনতা। আন্দোলন দ্রুতই গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামের নেটওয়ার্কের শিক্ষকরা থানায় গিয়ে আন্দোলনকারী ছাত্রদের উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। ২৭ জুলাই ঢাকার ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ অফিসে গিয়ে আটক ছাত্রনেতাদের দেখতে যান নেটওয়ার্কের শিক্ষকরা। ডিবিপ্রধান তাঁদের সঙ্গে দেখা করেননি; কিন্তু এসব তৎপরতা সংবাদের জন্ম দিতে থাকে এবং আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার করতে থাকে। ৩১ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা রীতিমতো যুদ্ধ করে সাদা পোশাকের পুলিশের হাত থেকে ছাত্রদের উদ্ধার করেন। নেটওয়ার্কের সিনিয়র অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের সভাপতিত্বে যে 'দ্রোহযাত্রা' অনুষ্ঠিত হয় ২ আগস্ট, সেখান থেকে শেখ হাসিনা সরকারকে পদত্যাগের আহ্বান জানানো হয়। বিপুল অংশগ্রহণের সেই দ্রোহযাত্রায় নেটওয়ার্কের শিক্ষকরা ব্যাপকভাবে অংশ নেন।

৪ আগস্ট সরকার পতনের আগের দিন, সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষক নেটওয়ার্ক 'রূপান্তরের রূপরেখা' ঘোষণার মাধ্যমে নতুন গণতান্ত্রিক সময়ে কী কী রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে যেতে হবে, তা জাতিকে জানায়। রূপরেখায় অন্তর্বর্তী সরকারের ধরন কেমন হবে, এর নির্দেশনা দেওয়া হয়। বলা হয়, সরকার জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার করবে এবং মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করবে; সরকার ছয় মাসের মধ্যে স্বৈরাচারী ও বৈষম্যমূলক ধারা সংস্কারের জন্য সাংবিধানিক সভা আহ্বান করবে যে সভার নির্দেশনা অনুযায়ী নির্বাচন আয়োজন করবে; শিক্ষার্থী-শিক্ষক-জনতার সমন্বয়ে একটি ছায়া সরকার গঠিত হবে, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অনেক পরামর্শ দেওয়া হয় 'রূপান্তরের রূপরেখায়'। একই দিনে শিক্ষার্থীনেতারা শেখ হাসিনা সরকারের পতনের এক দফা দাবি-সহ ৫ আগস্টের জন্য 'লংমার্চ ঢাকা' কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এবং ছাত্র-জনতা সারা দেশ থেকে ঢাকায় রওয়ানা দিলে লংমার্চে ভীত হয়ে শেখ হাসিনা ভারতে পলায়ন করেন এবং স্বৈরাচারী সরকারের পতন হয়।

সরকারের পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা ছাড়াও শিক্ষক নেটওয়ার্ক পরবর্তীকালে নানান ধরনের নীতিগত পরামর্শ আনুষ্ঠানিকভাবে দিতে থাকে। ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পরপরই ১০ আগস্ট 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে কী চাই' শিরোনামে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। এর আগে প্রধান উপদেষ্টা কে হবেন, এ বিষয়ে ৬ আগস্ট সামরিক বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীনেতাদের এক সভা হয়। সেখানে তারা অভিভাবক হিসাবে চান অধ্যাপক আসিফ নজরুল এবং শিক্ষক নেটওয়ার্কের অধ্যাপক মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খানকে। এ দুই অধ্যাপক ওই সভায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯ আগস্ট শিক্ষক নেটওয়ার্ক বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার প্রস্তাবসহ আরেকটি ধারণাপত্র প্রকাশ করে, যার শিরোনাম ছিল 'কেমন বিশ্ববিদ্যালয় চাই'।

শেখ হাসিনার পতনের পেছনে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ছাত্রনেতাদের ভূমিকা সবচেয়ে বড়ো ছিল। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন সাধারণ মানুষও। এটাও অনস্বীকার্য যে, শিক্ষকদের মধ্য থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের ভূমিকাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শিক্ষার্থীনেতা গুম-গ্রেফতার হলে তাঁদের উদ্ধারে এবং রাজপথে থেকে তাঁদের আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে উৎসাহ ও সাহস জুগিয়েছেন নেটওয়ার্কের শিক্ষকরা। স্বৈরাচারের পতন হলে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে সবাই। আন্দোলনের মতোই সেই দেশগঠনের অভিযাত্রায় শিক্ষক নেটওয়ার্ক অংশীদার হতে চেয়েছে। কিন্তু নতুন সময়ের প্রথম দিন থেকেই শিক্ষক নেটওয়ার্কের শিক্ষকদের দায়িত্ব থেকে দূরে রাখার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগও রাজনৈতিক দল হিসাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, তাঁরাও আক্রান্ত হন। রাজনৈতিক পালাবদলে মধ্য-ডানের বড়ো দল বিএনপি ও ডানপন্থি দল জামায়াতে ইসলামী শূন্যস্থানগুলোর দাবিদার হিসাবে নিজেদের ভাবতে থাকে। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের উপদেষ্টা পরিষদ বা সরকার মোটের ওপর উদারপন্থি হলেও ওই দুই দলের দাবি মেনে নিয়েই তাঁদের চলতে হচ্ছে। উপদেষ্টা পরিষদে দুজন ছাত্রনেতা উপদেষ্টা হন, পরে আরেকজন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হন। উপদেষ্টা হন অধ্যাপক আসিফ নজরুলও; কিন্তু বাদ পড়েন নেটওয়ার্কের তানজীমউদ্দিন খান। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়ও নেটওয়ার্কের শিক্ষকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। যখনই দায়িত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে কারও নাম শোনা গেছে, তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু হয়েছে যে তাঁরা ইসলামবিদ্বেষী। এরকম অযাচিত প্রচারণা হয়েছে কামরুল ইসলাম মামুন, তানজীমউদ্দিন খান, সামিনা লুৎফা প্রমুখের বিরুদ্ধে। ইসলামপন্থিদের প্রচারণা ও হইচইয়ের কাছে নতজানু হয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা এক পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনা কমিটি বাতিল করে দেন। কারণ, কমিটির সদস্য অধ্যাপক মামুন ও ড. সামিনার বিরুদ্ধে ইসলামপন্থিদের তীব্র আপত্তি ছিল। নেটওয়ার্কের শিক্ষকরা যাঁদের আন্দোলনকালে আগলে রেখেছিলেন, সেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতারাও নেটওয়ার্কের শিক্ষকদের সম্মান রক্ষা করতে এগিয়ে আসেননি। এভাবে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সব পদের দায়িত্ব মোটের ওপরে বিএনপি-জামায়াতপন্থি শিক্ষকরাই পেয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের শিক্ষকরা দ্রুতই বুঝে গেছেন যে তাঁদের বাদ দিলেই কেবল সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো স্বস্তিতে থাকে। তাই তাঁরা আগের মতোই প্রশ্ন করা, ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা এবং নিপীড়িতের পাশে দাঁড়ানোর কাজগুলো অব্যাহত রাখবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি প্রত্যক্ষভাবে সংস্কারের সুযোগ না পেলেও সংস্কার ও দেশগঠনের জন্য ইতোমধ্যে প্রবর্তিত নীতিগত ও পরামর্শমূলক ধারণাপত্র নিয়ে তাঁরা আরও বিস্তৃতভাবে কাজ করতে থাকবে।

ইমরান কামাল

লাইক, শেয়ার, মুক্তি

গণ-অভ্যুত্থানের পরোক্ষ অভিব্যক্তি ও হাজির থাকার রাজনীতি

১৪ জুলাই রাত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের হলগুলো থেকে স্লোগান উঠতে শুরু করল–'তুমি কে আমি কে, রাজাকার-রাজাকার; কে বলেছে কে বলেছে, স্বৈরাচার-স্বৈরাচার'। একই সঙ্গে দেখা গেল শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ, চিৎকার আর স্লোগানে কাঁপতে শুরু করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। সেই রাতে সাড়ে ১২টা থেকে শাহবাগ ও এর আশপাশের এলাকা এবং রাজু ভাস্কর্যসংলগ্ন অঞ্চলে থ্রিজি, ফোরজি ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।[১] জুলাই অভ্যুত্থানে ইন্টারনেট নিয়ে সরকারের খেলা শুরু হয়েছিল সেই রাত থেকে। এরপর ধাপে ধাপে ১৬ জুলাই গোটা দেশের ৫৯ বিশ্ববিদ্যালয়ে মোবাইল ইন্টারনেট সেবা বন্ধ ঘোষণা করা হয় বিটিআরসির তরফ থেকে। এদিনই পুলিশের নিশানা হন রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। আবু সাঈদসহ ছয়জনের মৃত্যু হয়েছিল ওইদিন। তিনি বাদে বাকি তিনজন চট্টগ্রামে মারা যান, দুজনের মৃত্যু হয় ঢাকায় (৬ আগস্ট ২০২৪, *কালের কণ্ঠ*)। মৃত্যুর আগে আবু সাঈদের প্রতিরোধ ও লুটিয়ে পড়ার দৃশ্য ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে নেট-দুনিয়ায়। ১৮ জুলাইয়ের প্রথম প্রহর থেকেই একে একে বন্ধ হয়ে যায় ফেসবুক, ইউটিউব এবং এরপর সব ধরনের ইন্টারনেট সেবা বন্ধ হয় সরকারি নির্দেশে। এর পাঁচদিন পর অর্থাৎ ২৩ জুলাই ব্রডব্যান্ড সেবা এলাকাভিত্তিক ধীরে ধীরে চালু হতে শুরু করে। ২৪ জুলাই গোটা দেশে ইন্টারনেট সেবা পুনরায় চালু হয়, যদিও গতি ছিল অস্বাভাবিকরকম ধীর আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো বন্ধ করেই রাখা হয়েছিল। এরপর থেকেই কখনো বন্ধ করে, কখনো গতি কমিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোয় প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে নেটিজেন-দুনিয়া নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে গেছে শেখ হাসিনার সরকার। এ খেলা চলেছে ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সরকার পতনের আগ পর্যন্ত। স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞাসা জাগে–বিরুদ্ধ স্বরের গণ-উত্থান স্তব্ধ করতে ইন্টারনেট বন্ধ করতে হয়েছিল কেন শাসকগোষ্ঠীকে। জবাব বোধকরি–ভয়। আর সেই ভয় অমূলকও ছিল না। শাসন-শোষণের দীর্ঘ ১৫ বছরের যে এক যাত্রা, সে পথে একাধিকবার এ পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছিল শেখ হাসিনার সরকারকে। কর্তৃত্ববাদের যে চরিত্র–সর্বময় হয়ে

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

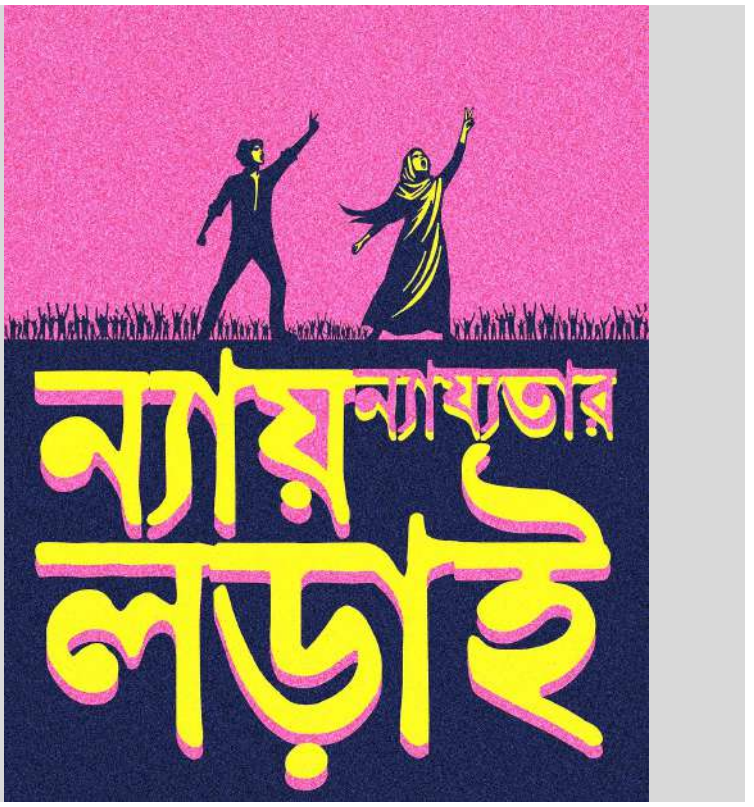

আর্টওয়ার্ক: দেবাশিস চক্রবর্তী

উঠতে চায়। সেই সর্বময় হয়ে ওঠার পথে তার বাসনার প্রথম শিকার হয় মানুষের জবান। তার প্রচেষ্টাই থাকে জবানের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম। তার কাছে মানুষ যেন প্রথম আধুনিক ডিসটোপিক উপন্যাসের স্রষ্টা ইয়েভজেনি জামিয়াতিনের আমার (We)-এর চরিত্রগুলোর মতো। যাদের চিনতে হয় I-330, O-90 এমন সব সংখ্যাবাচক চিহ্নায়ক দিয়ে। তার কল্পিত রাষ্ট্রের (One State) আইনসভার (উপন্যাসে যার নাম টেবিল) কাছে যারা খরচযোগ্য সংখ্যামাত্র।[২] চব্বিশের জুলাই-আগস্টজুড়ে গোটা দেশকে মানুষের জীবনকে খরচযোগ্য বানিয়ে মানবাধিকারের ভীষণ লঙ্ঘনের পর শেখ হাসিনার সরকারকে সর্বময় কর্তৃত্ববাদী বললেও বড্ড নরম শোনায়।

২.

নেটিজেন-দুনিয়া নিয়ে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার ভীতি নতুন ঘটনা নয়। জুলাই অভ্যুত্থানে পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের কর্মকাণ্ড এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও নয়। আরব বসন্তের বিভিন্ন পর্যায়ে মিশর, লিবিয়া, সিরিয়া ও তিউনিসিয়ায় ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর সেন্সরশিপ (censorship) আরোপ করার নজির আছে। মিশরে যেমন ২০১১ সালের ২৭ জানুয়ারি ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছিল সরকার।[৩] একই বছর ১৮ ফেব্রুয়ারি লিবিয়ায় বন্ধ করা হয়েছিল ইন্টারনেট সেবা।[৪] আরব বসন্তকালে মোটা দাগে তিন কৌশলে নেটিজেন-দুনিয়া নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। এর মধ্যে প্রথম কৌশল ছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিপুল প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে ভার্চুয়াল (virtual) জমিন দখলে নেওয়ার চেষ্টা। দ্বিতীয় কৌশল–সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং সুনির্দিষ্ট ওয়েবসাইট বন্ধ করে দেওয়া। তৃতীয় কৌশল–শাটডাউন (shutdown) করা। বলা বাহুল্য, শেখ হাসিনার সরকার বিক্ষুব্ধ মানুষকে ঠেকাতে তিন কৌশলই অবলম্বন করেছিল এবং প্রতি কৌশলেই তারা জনবুদ্ধির কাছে পরাস্ত হয়েছিল। বাংলাদেশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের লাগোয়া সময়ে একই পরিস্থিতির আরও দুই উদাহরণ ভারতের মণিপুর ও পাকিস্তানের। বিক্ষোভ দমন ও নেটিজেন-দুনিয়া নিয়ন্ত্রণে মণিপুর রাজ্যসরকার ও পাকিস্তানের সরকারও একই পথে হাঁটে। ভারতের মণিপুর রাজ্য ও পাকিস্তানে মূলত শহরাঞ্চলে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করা হয়। এই লিখন যখন চলছে, তখন খবর পাওয়া যাচ্ছে পিটিআই-এর বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে পাকিস্তান সরকার নতুন করে আংশিকভাবে ইন্টারনেট সেবা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে।[৫]

এ পরিস্থিতি বলে দেয়, গণবিরুদ্ধাচার একুশ শতকে ভার্চুয়াল টেকনোলজির কল্যাণে আত্মপ্রকাশের এক নতুন মাধ্যম পেয়েছে। বিশ শতক পর্যন্ত গণসংগ্রামে শরীরী দুনিয়াই ছিল লড়াইয়ের মূল ক্ষেত্র। শক্তি প্রদর্শনী হতো শরীরী বাস্তবের ময়দানে। কিন্তু একুশ শতকে এসে গল্পটা বদলেছে। অর্থাৎ, শরীরী দুনিয়ার পাশাপাশি ভার্চুয়াল দুনিয়াও এখন গণ-উত্থানের গুরুত্বপূর্ণ জমিন। ফলে কেবল 'মাঠ দখল' দিয়ে এখন আর প্রতিরোধের গল্পটা জমে না–নেটিজেন-দুনিয়াতে হাজির থাকাটাও সমানতালে গুরুত্ব বহন করে। এর কারণ বোধকরি ভেঙে বলার নয়–ইন্টারনেটের বদৌলতে সামাজিক যোগাযোগের যে বিরাট জাল বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়ে ভার্চুয়াল বাস্তবের দুনিয়া কায়েম করেছে হালে, প্রতিরোধ সংগ্রামের নতুন কারবালা সেই দুনিয়া। ফলে এখন প্রতিরোধের লড়াইয়ে মাঠ দখলে রাখলেই চলে না, নেটিজেন-দুনিয়ার ওপরও দখল রাখা লাগে। হালের শাসকগোষ্ঠী গণবিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে ইন্টারনেট সেবা যে বন্ধ করে দেয়–অনুমিত হয়, এর পেছনে একটা কারণ হলো নেটিজেন-দুনিয়া নিজেদের দখলে

রাখতে না পারা অথবা নেটিজেনদের ওপর মহামায়া বিস্তারে ব্যর্থতা। নেটিজেন-দুনিয়া গড়ে উঠেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এর ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম দুই কারণে কঠিন হয় শাসকগোষ্ঠীর জন্য। প্রথমত, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা চালিত হয়। ফলে বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রের সরকার এর বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, নেটিজেন-দুনিয়ার বিকেন্দ্রিকতা। প্রচলিত অর্থে আমরা যা মিডিয়া (বিশেষ করে যেসব মিডিয়া অঞ্চল নির্দিষ্ট, বৈশ্বিক নয়) বলে চিনি, কর্তৃত্ববাদ একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। প্রচলিত মিডিয়ার কেন্দ্রীভূত কাঠামো আছে এবং এর লোকবল নির্দিষ্ট। ফলে যে ক্ষমতা রাষ্ট্রে সর্বময় হয়ে উঠতে চায়, তার পক্ষে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ক্ষেত্রে কাজটি কঠিন।[৬] কারণ, এ মাধ্যম সবার জন্য উন্মুক্ত। ফলে যে কেউ, সমাজের যেকোনো অংশ থেকে এখানে খবরদাতা হয়ে উঠতে পারে। এ কারণে দেখা যায়, ২০১১ সালে, আরব বসন্তের কালে টুইটার, ফেসবুকের মতো প্ল্যাটফরমগুলো মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার লাখ লাখ প্রতিবাদীর মতপ্রকাশ ও যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। সেসময় নেট-দুনিয়ায় #Jan25, #FreeEgypt, #SaveSyria, #StandWithTunisia প্রভৃতি হ্যাশট্যাগ প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠে। হাজির হয় জনমানুষের ক্ষমতার প্রকাশরূপে। বাংলাদেশে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

কর্তৃত্ববাদী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণ-উত্থানে অংশগ্রহণের যেমন প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ধরন-রকম আছে, সংগ্রামের ভার্চুয়াল ময়দানেও তেমন অংশগ্রহণের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মাত্রা দৃশ্যমান হয়। গণ-উত্থানের সময় নেটিজেন-দুনিয়ায়ও ব্যবহারকারীরা একই মাত্রায় সক্রিয় থাকেন না। এক্ষেত্রেও অংশগ্রহণের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ রূপ আছে

৩.

শাসকগোষ্ঠী কিংবা সরকার বা regime-এর বিরুদ্ধে মানুষের সমবেত প্রতিরোধ, জনসংহতি আর যূথবদ্ধতার কঠোর-কঠিন প্রকাশ সভ্যতার ইতিহাসে নতুন নয়। মাত্রা বিচারে গণ-অভ্যুত্থানে মানুষের অংশগ্রহণ মোটা দাগে দুই ধরনের হয়। এক হয় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, আর হয় পরোক্ষ। একদিকে চলে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম–শাসক, শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্মুখসমর। অন্যদিকে থাকে বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠীর সমুদ্রে ভাসমান তিমির মতো নোনাজলে ডুবে থাকা বিরাট এক শরীর–যারা পরোক্ষভাবে সেই সংগ্রামে শক্তি-সমর্থন জুগিয়ে চলে। কোনো গণ-অভ্যুত্থানেই এই প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষতার কোনো স্থির অবস্থান হয় না। একদিন যাঁরা পরোক্ষ ভূমিকায় থাকেন, আরেক দিন দেখা যায় তাঁরাই ময়দানে-মিছিলে সবার আগে চলেন। এ স্বতঃস্ফূর্ততা গণবিক্ষোভের গণচরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য।

কর্তৃত্ববাদী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণ-উত্থানে অংশগ্রহণের যেমন প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ধরন-রকম আছে, সংগ্রামের ভার্চুয়াল ময়দানেও তেমন অংশগ্রহণের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মাত্রা দৃশ্যমান হয়। গণ-উত্থানের সময় নেটিজেন-দুনিয়ায়ও ব্যবহারকারীরা একই মাত্রায় সক্রিয় থাকেন না। এক্ষেত্রেও অংশগ্রহণের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ রূপ আছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে এমন নেটিজেন আছেন, যাঁরা সরাসরি লিখে-বলে, ঘোষণা দিয়ে অভ্যুত্থানের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, সরকারি প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন, ক্রমাগত সামাজিক মিডিয়ায় সরব থেকেছেন; আবার এমন নেটিজেনও আছেন, যাঁরা অন্যের বক্তব্য, এজমালি সংবাদদাতাদের বার্তা, খবর, কথা, ভিডিয়োতে লাইক দিয়ে, শেয়ার করে, হ্যাশট্যাগ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে কিংবা নিজের প্রোফাইল ছবি লাল করে অভ্যুত্থানের পক্ষে নিজেদের অবস্থানের জানান দিয়েছেন। অভ্যুত্থানের শরীরী ময়দানের মতো ভার্চুয়াল ময়দানেও এই পরোক্ষভাবে সক্রিয় মৃদুকণ্ঠীরা আকারে বড়ো। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ভার্চুয়াল দুনিয়ায় পরোক্ষ সক্রিয়তায়ও ঝুঁকি ছিল। সেই ঝুঁকি তখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোয় যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে অভ্যুত্থানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন, তাঁদের তুলনায় মাত্রাগত দিক থেকে কম বটে; কিন্তু কাজটা একেবারে ঝুঁকিমুক্ত ছিল না। জুলাই-আগস্টে জনমানুষের ওপর নজরদারি যে মাত্রায় উন্নীত হয়েছিল তাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোয় গণ-অভ্যুত্থানসংশ্লিষ্ট কোনো পোস্টে লাইক দেওয়া বা অভ্যুত্থানসংশ্লিষ্ট কোনো কনটেন্ট শেয়ার করার জন্য হুমকি-ধমকি, এমনকি শ্রীঘরে চালান অস্বাভাবিক ছিল না। তাছাড়া বিগত ১৫ বছরে লীগের যে বিস্তৃত রাজনৈতিক বন্দোবস্ত, রাষ্ট্রের ছোটো-বড়ো প্রতিষ্ঠানে যে মাত্রায় আওয়ামীকরণ হয়েছিল, তাতে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে না হলেও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে লাইক-শেয়ারের কারণে চাকরি হারানোর আশঙ্কা ভালো মাত্রাতেই ছিল।

সেসময় এসব ভীতি অগ্রাহ্য করে অথবা সঙ্গে নিয়েই নেটিজেনদের একটা বিরাট অংশ পরোক্ষভাবে সক্রিয় থেকেছে এবং ধর্ম-বর্ণ-জাতি-লিঙ্গ নির্বিশেষে তাঁরা গণের অন্তর্ভুক্তিমূলক চেহারা গঠনে ভূমিকা রেখেছে। প্রত্যেক নেটিজেনের যে নিজস্ব বলয় থাকে, একে সংঘবদ্ধ করেছেন। খোঁজ করলে এমন অনেক গল্প পাওয়া যাবে, যেখানে দেখা যাবে সরকারের পাইকারি নির্মমতা আর অভ্যুত্থানের গতির সঙ্গে সংগতি রেখে বেড়েছে ঝুঁকি গ্রহণের সাহস। যে নেটিজেন হয়তো প্রথমে বন্ধুর পোস্ট লাইক করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন, ক্রমে হয়তো তিনিই অভ্যুত্থানের নানান অনুষঙ্গ শেয়ার করতে শুরু করেছেন, হ্যাশট্যাগ কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন, ফেসবুকের দেওয়ালচিত্র আর কার্টুনে রাঙিয়েছেন, নিজের প্রোফাইল ছবি বদলে অসংখ্য লাল বিন্দুর অংশীজন হয়েছেন। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যেই হয়তো তাঁরা খুঁজেছেন মুক্তির স্বাদ। সঞ্চয় করেছেন কর্তৃত্ববাদী অচলায়তনের বিপরীতে দাঁড়ানোর সাহস।

৪.

কোনো গণ-অভ্যুত্থানই কেবল মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সৃজিত হয় না। প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের তলে থাকে পরোক্ষের

বিরাট মহফিল। গণের ভিড়ে মিশে থাকে অনেক মুখ। মৃতের তালিকায় এমন অনেক নাম থাকে, যাঁরা মানুষে স্মরণের বাইরে থেকে যান। এমন অনেক নাম হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে থাকে, যাঁদের পরিচয় শনাক্ত হয় না। যাঁদের গল্প (এমনকি ক্ষেত্রবিশেষের নামও) অজানা থেকে যায়। এ বিরাট পরোক্ষ শক্তির যূথ, সমাবেশকে বাইরে রাখলে উত্থানের কাহিনিটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কারণ, যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু যেমন শরীর; যতটুকু দেখা যায় না, ততটুকুও শরীর। যারা এ মুহূর্তে এই লিখনের পাঠক–বোধকরি তাঁরা, আমরা প্রায় সবাই জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছি। সেই মার্গ অতিক্রমের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বলতে পারি, প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ অংশগ্রহণকারীদের একটা বিরাট অংশ এই অভ্যুত্থানে শামিল হয়েছিলেন নৈতিক দায় থেকে। অনেকের মধ্যেই কাজ করেছিল দুষ্ট দমন, মন্দ পতনের অভিলাষ। অনেকের কাছেই রাজনৈতিক নয়, এ ছিল নৈতিক দায়। তাঁরা ন্যায় আর নীতির পক্ষের রাজনীতিতে একাত্ম হতে চেয়েছিলেন। যদিও রাজনীতি একটা স্বতন্ত্র কাজও। এর আছে নিজস্ব মাপকাঠি। শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-ভুলের সবটা ধরা যায় না। কেবল নীতিপথে এ গাড়ি চলে না। কী উপায় তবে রাজনীতিকে চেনার–সেকথা না হয় ওঠানো থাক অন্য কোনো সময়ের জন্য।

তথ্যসূত্র

১. Mahmudul Hasan (August 13, 2024), ‘What you need to know about internet crackdown in Bangladesh’, *The Daily Star*, Dhaka

২. Yevgeny Zamyatin, *We*, 1922

৩. Woodcock, Bill, "Overview of the Egyptian Internet Shutdown" (PDF). Packet Clearing House. Archived from the original (PDF) on 26 January 2012. Retrieved 4 May 2012.

৪. Alberto Dainotti; Claudio Squarcella; Emile Aben; Marco Chiesa; Kimberly C. Claffz; Michele Russo; Antonio Pescape (2011). ‘Analysis of country-wide internet outages caused by censorship’. *Proceedings of the 2011 ACM SIGCOMM conference on Internet measurement conference*.

৫. https://www.rferl.org/a/pakistan-mobile-internet-partial-shut-down-imran-khan-pti-protest/33213788.html

৬. মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রগুলো আরব বসন্তের আগেই এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিল যে, ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অবাধ দুনিয়া তাদের ক্ষমতাকাঠামোকে সংকটের মধ্যে ফেলতে পারে। Jean-Pierre Filiu দেখান, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলো ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বেশকিছু আগাম পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিল: ...all the Arab regimes had understood over the years that close monitoring of the Internet was far more efficient than its brutal prohibition. Syria had long banned the Internet, while cybercafes were booming in neighbouring Lebanon, but Bashar al-Asad, after taking over from his deceased father in June 2000, had lifted the ban. The various security forces, which exchanged notes and memos on that topic at their coordination hub in Tunis, 2 had devised ways and means to monitor chats and forums, while developing 'honeypot' websites to attract the virtual opponents and eventually strike them.' Jean-Pierre Filiu (2011), *THE ARAB REVOLUTION: Ten Lessons from the Democratic Uprising*, Oxford University Press, New York.

সারোয়ার তুষার

ভারতীয় মিডিয়ায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পরিবেশনার ধরন

২০২৪ সালের জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে, বিশেষত ১৬-১৭ জুলাইয়ের পর বাংলাদেশের আন্দোলনবিষয়ক সংবাদ পৃথিবীর অধিকাংশ গণমাধ্যম গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে। আন্দোলনে সহিংসতা ও ব্যাপক প্রাণহানি এর মূল অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে বলে অনুমান করা যায়। তবে নিঃসন্দেহে, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে অনেক বেশি সংবাদ, প্রতিবেদন ও মতামত প্রকাশ করেছে। বর্তমান প্রবন্ধে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম কীভাবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ও হাসিনার পতনকে তুলে ধরেছে, তা দেখানোর চেষ্টা করব। ভারতীয় মিডিয়ায় বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থানের পরিবেশনা যে ভারতীয় 'মূলধারা'র এস্টাবলিশমেন্টের চালু দৃষ্টিভঙ্গির অংশ, তা এ প্রবন্ধের অন্যতম এক দাবি।

লেখক: গবেষক, রাজনীতিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

'রাজাকার' বনাম 'স্বৈরাচার'

আন্দোলন চলাকালে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে, প্রধানত রয়টার্স বা বাংলাদেশি বিভিন্ন পত্রিকার বরাত দিয়ে রোজকার সংবাদই প্রকাশ করেছে। আন্দোলনে কতজন মারা গেলেন, কী বিষয়ক আন্দোলন, কখন কারফিউ জারি হলো, সরকারি দলের বক্তব্য প্রভৃতি ছিল সেই সংবাদের মূল উপজীব্য বিষয়। আন্দোলনকারীদের ভাষ্যের চেয়ে তুলনামূলকভাবে সরকারি দলের বক্তব্যকে 'একমাত্র সত্য' হিসাবে প্রচার করার প্রবণতা খেয়াল করা যায়। আন্দোলন চলাকালে ভারতীয় মিডিয়া শেখ হাসিনাকে স্বৈরাচারী হিসাবে চিহ্নিত করেনি; তবে পতনের পর বিভিন্ন মিডিয়ায় তাঁর শাসনামল যে স্বৈরতান্ত্রিক ছিল, সেটা উল্লেখ করেছে। হাসিনার আমলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেও বেকারত্বকেই আন্দোলনের প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছে ভারতীয় মিডিয়া। কিছু কিছু প্রতিবেদন সাম্প্রতিক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মন্থর গতির কারণ হিসাবে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধকেও চিহ্নিত করেছে।[১] বিগত সরকারের প্রধান শেখ হাসিনাসহ তাঁর মন্ত্রিপরিষদও যে একই ধরনের দাবি করত, তা পাঠকের নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা। গণতন্ত্রহীনতা এবং দীর্ঘদিন পদ্ধতিগতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন–কারণ হিসাবে হয় অনুল্লিখিত ছিল অথবা মৃদুভাবে এসেছে।

শেখ হাসিনা যখন আন্দোলনকারীদের 'রাজাকার' বলে গালি দিলেন, তখন থেকে আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। বলা যায়, শেখ হাসিনা কর্তৃক আন্দোলনকারীদের 'রাজাকার' ও 'রাজাকারের নাতি-পুতি' তকমা দেওয়ার পর আন্দোলন আর কোটা সংস্কারে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ওই মুহূর্তটিকে আমরা শেখ হাসিনা রেজিমের 'শেষের শুরু' হিসাবে সাব্যস্ত করতে পারি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে 'রাজাকার' স্লোগান বেশ গুরুত্ব পায়। বিশেষত বিশ্লেষক ও কলামিস্টদের মধ্যে 'রাজাকার' শব্দের ব্যবহারের নানা অর্থ তৈরি হয়। হাসিনার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনকারীদের স্লোগান ছিল, 'তুমি কে আমি কে, রাজাকার-রাজাকার; কে বলেছে কে বলেছে, স্বৈরাচার-স্বৈরাচার'। স্লোগান ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া থেকে স্পষ্ট যে, পতিত প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক 'রাজাকার' সম্বোধন আন্দোলনকারীরা অপমান ও গালি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এ 'অপমান' ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে যেমন উৎসারিত, তেমনই বিগত এক দশকে আওয়ামী রেজিমের যেকোনো সমালোচনাকে সরকার/হাসিনা কর্তৃক 'স্বাধীনতাবিরোধী' বলে সাব্যস্ত করার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াও।

কিন্তু ভারতীয় মিডিয়া মুক্তিযোদ্ধা কোটার বিরুদ্ধে আপত্তি এবং 'রাজাকার' স্লোগানের ব্যবহারকে দেখেছে আন্দোলনকারীদের একাত্তরের ইতিহাসবিষয়ক 'অজ্ঞতা' ও 'অনীহা' হিসাবে, যাকে তারা একাত্তরকে ভুলে যাওয়ার নামান্তর হিসাবে অভিহিত করতে চেয়েছে। যেমন: *দ্য প্রিন্টে* প্রকাশিত এক কলামে মন্তব্য করা হয়েছে:

ঢাকার রাস্তায় চলমান কোটা আন্দোলন থেকে এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের তরুণরা আগেকার প্রজন্মগুলোর মতো একাত্তরের আসল ঘটনা খুঁড়ে দেখে না। তদুপরি, অনেকেই বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভূমিকা খারিজ করতে চায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালে যে জাতিগত নিধন চালিয়েছিল, সেটাও মোটা দাগে বিস্মৃত। গড়পড়তা বাংলাদেশি তরুণরা ক্রিকেট খেলায় ভারতের তুলনায় পাকিস্তান দলের প্রতি বেশি অনুরাগ দেখিয়ে থাকে।[২]

পাশাপাশি, দ্য প্রিন্ট অন্যত্র 'রাজাকার' স্লোগানের এ ব্যবহারকে দেখেছে 'রাজাকার' বনাম 'স্বৈরাচার' দ্বন্দ্ব হিসাবে এবং দাবি করেছে, আন্দোলনকারীরা নাকি স্বৈরাচারের চেয়ে রাজাকারকেই বেশি পছন্দ করবে। বলা হয়, 'If not Hasina, who has been a standard response from the PM's supporters. But now that students say they'd much prefer 'Razakars' over a dictator like her, it's time for the PM to take stock of the narrative.'[৩]

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, 'রাজাকার' তর্কে আওয়ামী বয়ান এবং ভারতীয় মিডিয়া বয়ানের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, শেখ হাসিনা আন্দোলনকারীদের 'রাজাকারের নাতি-পুতি' তকমা দিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ ও উত্তেজনার শুরুও এ তকমার প্রতিক্রিয়ায়। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে গভীর রাতে হলগুলো থেকে বেরিয়ে এসেছেন, ক্যাম্পাসে মিছিল করেছেন। কী তাঁদের ক্ষুব্ধ করেছে, তা তাঁদের স্লোগান থেকে স্পষ্ট: এক. 'তুমি কে আমি কে? রাজাকার-রাজাকার; কে বলেছে কে বলেছে, স্বৈরাচার-স্বৈরাচার।' দুই. 'চেয়েছিলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার।' তিন. 'তুমি নও আমি নই, রাজাকার-রাজাকার।' চার. 'লাখো শহিদের রক্তে কেনা, দেশটা কারও বাপের না।'

যেকোনো ন্যূনতম বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি ওপরের স্লোগানগুলোয় দুটি জিনিস দেখতে পাবেন। প্রথমত, শিক্ষার্থীরা দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে 'রাজাকার' ট্যাগ প্রত্যাশা করেন না; তাই তাঁরা ক্ষুব্ধ। দ্বিতীয়ত, 'রাজাকার' শব্দের সঙ্গে আমাদের যে ইতিহাস জড়িয়ে আছে, শিক্ষার্থীরা সেই ইতিহাস ধারণ করেন না। এ কারণেই তাঁরা আক্ষেপ ও ক্ষোভের সঙ্গে স্লোগান দিয়েছেন অধিকার চাইতে গিয়ে 'রাজাকার' বনে যেতে হলো! পাশাপাশি তাঁরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত এ দেশ কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়; যাঁরা তা মনে করে, তাঁরা 'স্বৈরাচার'।

আন্দোলনের শুরু থেকে এবং হাসিনার পতনের পরও জামায়াতে ইসলামী ভারতীয় মিডিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছিল। আমরাও এও দেখব, তাঁদের প্রায় সব আলোচনায়ই বিএনপির প্রসঙ্গ গরহাজির ছিল, থাকলেও গুরুত্বহীনভাবে ছিল। যদিও বিএনপি ছিল আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড়ো বিরোধী দল, যাদের দুইবার সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে। জামায়াতে ইসলামীকে বারবার ফোকাস করা এবং আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসাবে হাজির করার রাজনীতি নিয়ে আমরা পরে বাতচিত করব, আপাতত *আনন্দবাজার* থেকে একটি সংবাদ দেখা যেতে পারে:

> "প্রায় দু'শো জনের প্রাণহানির পরে ২১ জুলাই বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আন্দোলনকারীদের দাবি অনুকূলে রায় দেওয়ার পরে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছিল। যদিও ছাত্র হত্যায় জড়িত পুলিশকর্মী এবং ছাত্রলীগ কর্মীদের বিচারের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'। এই পরিস্থিতিতে গত ৩১ জুলাই হাসিনা সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বাংলাদেশের কট্টরপন্থী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামি এবং তাদের জঙ্গি মনোভাবাপন্ন শাখা সংগঠন ইসলামি ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ করার প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা করার পরে নতুন করে দানা বাঁধে বিক্ষোভ। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি এবং জামায়াতের নেতৃত্বে গ্রামে-গঞ্জেও শুরু হয় পুলিশ এবং আওয়ামী নেতাকর্মীদের উপর হামলা। গত শনিবার পড়ুয়াদের মিছিলে গুলির পরেই কার্যত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় পরিস্থিতি।"[৪]

এই প্রতিবেদন অনুযায়ী, আন্দোলন দমে গিয়েছিল; কিন্তু ৩১ জুলাই জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু করার পর 'নতুন করে দানা বাঁধে বিক্ষোভ'। এ পর্যন্ত পড়ে মনে হতে পারে, এ আন্দোলনের নেতৃত্বে বা মূল কুশীলব ছিল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। যদিও এ নিষিদ্ধের ন্যূনতম কোনো প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল, সিভিল সোসাইটি ও আন্দোলনকারীরা দেখায়নি। কেননা সবাই আওয়ামী লীগের এ ধরনের 'নিষিদ্ধের খেলা' সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। এমনকি খোদ জামায়াতে ইসলামী পর্যন্ত ওই নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখানোর সিদ্ধান্ত নেয়। জামায়াত নেতারা মনে করেছেন, নিষিদ্ধ ঘোষণা তাঁদের জন্য একটি 'ফাঁদ'। তারা যদি প্রতিক্রিয়া দেখায় বা রাজপথে কর্মসূচি পালন করে, তাহলে সরকার চলমান ছাত্রদের আন্দোলন থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেবে।[৫]

তবে আওয়ামীপন্থি বুদ্ধিজীবীদের কয়েকজন এ নিষিদ্ধ নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে পত্রিকায় কলাম লিখেছিলেন। এর বাইরে এটিকে সবাই আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক হাতিয়ার ও পদক্ষেপ হিসাবেই বিবেচনা করেছিলেন। আনন্দবাজারের প্রতিবেদনে এর পরের অংশে বলা হয়েছে, বিএনপি ও জামায়াতের নেতৃত্বে এরপর গ্রামে-গঞ্জে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ওপর হামলা শুরু হয়। কিন্তু তখনও পুলিশ, বিজিবি ও আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ আক্রমণ করে যাচ্ছিল। একের পর এক গ্রেফতার হচ্ছিলেন আন্দোলনকারীসহ বিরোধী দলের নেতাকর্মীরা। ৫ আগস্ট হাসিনার পতনের পর

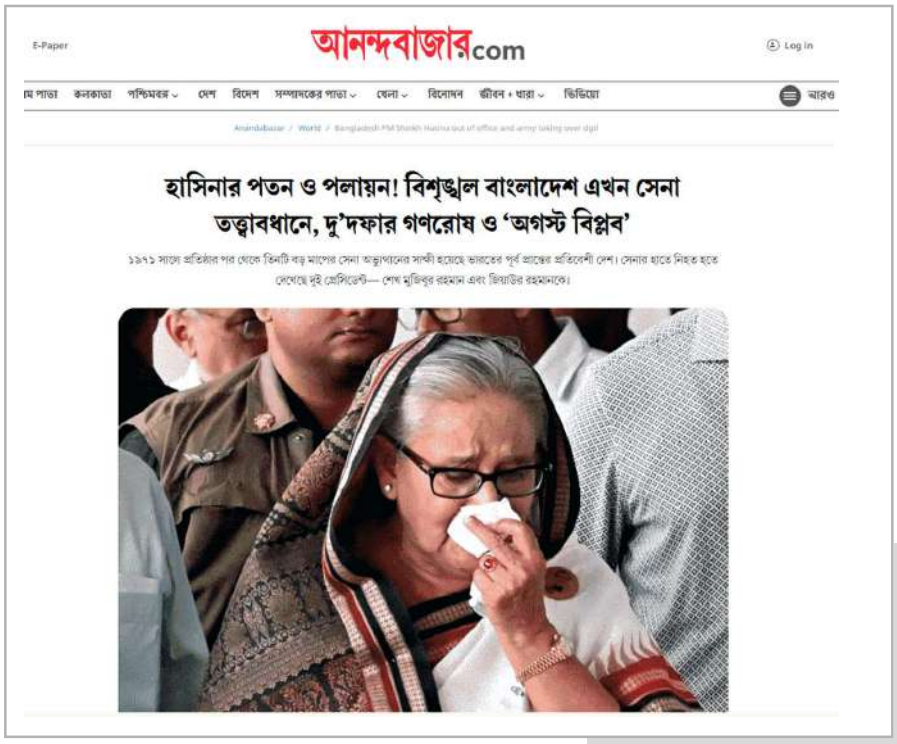

E-Paper

আনন্দবাজার.com

Log in

ম পাতা কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ দেশ বিদেশ সম্পাদকের পাতা খেলা বিনোদন জীবন + ধারা ভিডিয়ো আরও

হাসিনার পতন ও পলায়ন! বিশৃঙ্খল বাংলাদেশ এখন সেনা তত্ত্বাবধানে, দু’দফার গণরোষ ও ‘অগস্ট বিপ্লব’

১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে তিনটি বড় মাপের সেনা অভ্যুত্থানের সাক্ষী হয়েছে ভারতের পূর্ব প্রান্তের প্রতিবেশী দেশ। সেনার হাতে নিহত হতে দেখেছে দুই প্রেসিডেন্ট— শেখ মুজিবুর রহমান এবং জিয়াউর রহমানকে।

আনন্দবাজার, অনলাইন
৫ আগস্ট ২০২৪

আওয়ামী লীগের নেতা ও পুলিশের ওপর উত্তেজিত জনতা আক্রমণ করে; কিন্তু আনন্দবাজার সে ঘটনাগুলোর কালিক ধারাবাহিকতা বজায় না রেখে পরের ঘটনাকে আগে নিয়ে আসে। তাতে এ বয়ান তৈরি হয় যে, আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু জামায়াতকে নিষিদ্ধ করার পর জামায়াত ও বিএনপি মিলে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রামে-গঞ্জে আক্রমণ করে।

আওয়ামী রেজিমের পতন: গণ-অভ্যুত্থান নাকি সামরিক কু?

আন্দোলন যখন তুঙ্গে, শেখ হাসিনা আরও বেশি বলপ্রয়োগের ইচ্ছাপোষণ করলেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বল প্রয়োগে অস্বীকার করে। আন্দোলনের তীব্রতা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ভিন্নভাবে ভাবতে বাধ্য করেছিল। ৫ আগস্ট আন্দোলনকারীদের তোপের মুখে হাসিনার পতন হলে ভারতীয় মিডিয়া এ পতনকে নানাভাবে চিত্রায়ণ করে। হাসিনার পতনের পর কিছু কিছু সংবাদমাধ্যমে হাসিনার শাসনামলকে অন্যান্য বিশ্লেষকের বরাত দিয়ে ‘অটোক্র্যাটিক’ বলে উল্লেখ করা হলেও এ পতনকে প্রধানত দুভাবে দেখা হয়। আপাতত প্রতিনিধিত্বশীল দুটি সংবাদ গ্রহণ করা যেতে পারে।
শেখ হাসিনার পতন এবং দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার দিন (৫ আগস্ট) রয়টার্সের বরাতে *দ্য প্রিন্ট* বলে,

> ‘Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina's resignation after weeks of violent protests, announced on Monday in a televised address by the army chief, has brought focus once more to the country's history of political upheaval and coups.’[৬]

এখানে যে ইতিহাস তুলে ধরা হয় তাতে ৫ আগস্টের হাসিনার পতনকে একটি ‘সামরিক কু’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। চব্বিশের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকে ১৯৭৫, ১৯৮১, ১৯৮২, ২০০৭, ২০০৯ ও ২০১২ সালের ধারাবাহিকতায় উল্লেখ করা হয়। চব্বিশ ব্যতীত অন্যসব ছিল ‘সামরিক কু’ বা সামরিক বিদ্রোহের ঘটনা/প্রচেষ্টা বা ‘সামরিক কু’র মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের ঘটনা। যদিও চব্বিশের জুলাই-আগস্টে বাংলাদেশে যা ঘটেছে, এর ঐতিহাসিক নজির হচ্ছে ১৯৬৯ ও ১৯৯০ সালের গণ-অভ্যুত্থান বা গণ-আন্দোলন। কিন্তু উল্লিখিত প্রতিবেদন সেই ইতিহাসকে ‘সামরিক কু’র ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে বাংলাদেশের জনগণের ঐতিহাসিক কর্তাসত্তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। ওই প্রতিবেদন পড়লে বাংলাদেশের ইতিহাস ও বর্তমান সম্পর্কে অনবহিত এমন বিদেশি পাঠকের বিভ্রান্ত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকে না। একুশ শতকের বৈশ্বিক ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গণ-অভ্যুত্থানকে ‘সামরিক কু’ হিসাবে প্রচার করে ভারতীয় মিডিয়া গর্হিত কাজ করেছে, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। গণ-অভ্যুত্থানে জনগণের সক্রিয়তা ও গণক্ষমতার যে নজির থাকে, সাধারণত ‘সামরিক কু’তে তা অনুপস্থিত থাকে। ফলে এ গণ-অভ্যুত্থানকে ‘সামরিক কু’ বলার মাধ্যমে গণসক্রিয়তা এবং এর গণতান্ত্রিক বাসনাকে খারিজ করা হয়।

গণ-অভ্যুত্থানের তিনদিন পর ৮ আগস্ট *দ্য প্রিন্ট* পত্রিকার এক প্রতিবেদনে ঘোষণা করা হয়, বাংলাদেশ এখন ইন্ডিয়ার ‘সম্ভাব্য শত্রু’। ওই প্রতিবেদনে জুলাই অভ্যুত্থানকে ‘বোগাস’ সাব্যস্ত করে নিজ দেশ তথা ইন্ডিয়ার স্বার্থের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। পাকিস্তান ঘোষিত শত্রু, চীন আরও বড়ো শত্রু; এখন বাংলাদেশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ফলে বাংলাদেশও ‘সম্ভাব্য শত্রু’।[৭] যেকোনো রাষ্ট্রই অন্য রাষ্ট্রের ‘সম্ভাব্য শত্রু’ হতে পারে; কিন্তু প্রাক-অভ্যুত্থানপর্বে তথা আওয়ামী রেজিমে বাংলাদেশ কেন ইন্ডিয়ার ‘সম্ভাব্য শত্রু’ ছিল না, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পরপরই কেন আচমকা ইন্ডিয়ার ‘সম্ভাব্য শত্রু’র তালিকায় ঢুকে গেল, এর উত্তর

ওই নিবন্ধে পাওয়া যায় না। ওই নিবন্ধের শিরোনামের 'এখন' (now) শব্দে বিশেষ খেয়াল না রাখলে শত্রু-মিত্রের এ খেলা ঠিকঠাক ধরা যাবে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, দীর্ঘ অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী শাসনে পিষ্ট বাংলাদেশের জনগণ গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হাসিনা রেজিমের পতন ঘটিয়ে এক মহা অন্যায় করে ফেলেছে!

আওয়ামী লীগ, মুক্তিযুদ্ধ ও ধর্মনিরপেক্ষতা: গুলিয়ে ফেলা হয়েছিল একবিন্দুতে

এবার দ্বিতীয় ধরনের সংবাদের দিকে নজর দেওয়া যাক। হাসিনার পতনের পর মুজিবের ভাস্কর্য ভাঙচুর, ধানমন্ডিতে তাঁর বাসভবনে অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে 'আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে' ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে না দেখে এ ঘটনাগুলোকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বনাম 'ধর্মভিত্তিক' রাজনীতির ছকে দেখা হয়েছে। *আনন্দবাজারের* প্রতিবেদন থেকে:

> সেই সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের সমর্থকদের কোণঠাসা করা শুরু হতে থাকে বলে অভিযোগ। সেনাপ্রধানের কুরসিতে বসে ক্ষমতা দখল করা জিয়াউর রহমান, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এমনকি, অবাধ ভোটে ক্ষমতা দখলকারী খালেদা জিয়ার আমলেও সেই ধারা বজায় থাকার অভিযোগ উঠেছে বারবার। ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদের ভোটে জিতে হাসিনা দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে সেই ধারা কিছুটা বদলেছিল বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ মনে করে। এবার হাসিনাবিরোধী আন্দোলনে 'নিষিদ্ধ' জামায়াতে ইসলামীর সক্রিয় অংশগ্রহণ কি আবার ফিরিয়ে আনবে সেই পুরোনো স্মৃতি। মুজিবের মূর্তি ভাঙা এবং ধানমন্ডির সংগ্রহশালায় অগ্নিসংযোগ 'ইঙ্গিতবাহী' বলেই মনে করছেন তাঁরা।[৮]

হাসিনার পতনের পরপর প্রকাশিত এ প্রতিবেদন আওয়ামী বয়ানের পুনরুৎপাদন ছাড়া আর কিছু নয়। মুক্তিযুদ্ধ ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের সমর্থকরা জিয়া, এরশাদ হয়ে খালেদা জিয়ার আমল পর্যন্ত কোণঠাসা ছিলেন, যা ২০০৮ সালে হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর বদলে গিয়েছিল। হাসিনা যেহেতু নেই; আবারও 'নিষিদ্ধ' জামায়াতে ইসলামীকে ফিরিয়ে আনার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। যদিও হাসিনা সরকার পতনের মাত্র চারদিন আগে জামায়াতকে নিষিদ্ধ করেছিল রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসাবে; কিন্তু আনন্দবাজারের প্রতিবেদন দেখে মনে হতে পারে জামায়াত নিষিদ্ধ ছিল অনেকদিন। মুজিবের মূর্তি ভাঙাকে সেই ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থকদের 'কোণঠাসা' হওয়ার নতুন ইঙ্গিত হিসাবেই দেখছে আনন্দবাজার। এখানেও আওয়ামী লীগের পতন মানে জামায়াতে ইসলামীর উত্থান হিসাবে ধরে নেওয়া হচ্ছে। হাসিনার পতনের পরপর ভারতীয় প্রিন্ট মিডিয়ায়ও জামায়াতের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সংবাদে ভরপুর হয়ে যায়। যেমন: বিজিপি নেতার বরাতে দ্য প্রিন্ট সংবাদ প্রকাশ করে, Jamaat may take control in Bangladesh, expect an influx of Hindus।[৯]

'হিন্দু'দের ওপর সহিংসতা নিয়ে প্রোপাগান্ডা

হাসিনার পতনের পর ভারতীয় মিডিয়া (এবং আমরা পরে দেখব, সেটা ভারত রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিদের সুরেরই আরেক রূপ মাত্র) সবচেয়ে দ্রুত এবং তীব্র প্রোপাগান্ডা করে হিন্দুদের ওপর সহিংসতা নিয়ে। আমরা দেখেছি, অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগের ওপর যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা দেয়, এর অংশ হিসাবে আওয়ামী লীগের হিন্দু নেতারাও শিকার হন। এমনকি হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ বিভিন্ন বিবৃতিতে জানায়, আওয়ামী লীগের সম্পৃক্ততা ছাড়া হিন্দুদের ওপর আক্রমণ একেবারেই হয়নি। সিলেটের ঐক্য পরিষদ জানায়, আওয়ামী লীগ সম্পৃক্ততা ব্যতীত সংখ্যালঘুদের ওপর কোনো সহিংসতা হয়নি। উল্লিখিত সংগঠনের সিলেট জেলা শাখার এক শীর্ষ নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'সিলেটে এখন পর্যন্ত আমার জানামতে, সাধারণ কোনো হিন্দু আক্রান্ত হননি। যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁরা সবাই আওয়ামী লীগ নেতা। তাঁদের অপকর্মের কারণে সব হিন্দুই এখন আতঙ্কগ্রস্ত।'[১০]

বাস্তব সত্য হচ্ছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীসহ রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে রাত জেগে মন্দির পাহারা দিয়েছেন। সিলেটে হিন্দুদের উপাসনালয় ও বাড়িঘরের নিরাপত্তায় পাড়ায় পাড়ায় মাইকিং করেছে বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। এ ব্যাপারে অবশ্য ভারতীয় মিডিয়ায় তেমন কোনো সংবাদ প্রকাশিত হতে দেখা যায়নি।

কিন্তু ভারতীয় মিডিয়া হাসিনা পতনের পরপর হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রোপাগান্ডা রটিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রোপাগান্ডার কিছু নজির দেওয়া যেতে পারে।

যেমন : *মিরর নাও* ইউটিউব চ্যানেল 'Attack On Hindus In Bangladesh? Mass Murders, Killings By Mob' নামে একটা ভিডিয়ো ফুটেজে চারটি বাড়ির, যার মধ্যে দুটি মুসলমান মালিকানাধীন ছিল, তাতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটকে হিন্দুদের ওপর হামলা বলে চালিয়ে দেয়। ভিডিয়ো ফুটেজে 'ম্যাস মার্ডার' উল্লেখ করে বিভ্রান্তিকর শিরোনাম করে। প্রকৃতপক্ষে ওই স্থানে কোনো ধরনের ম্যাস মার্ডারের আলামতের সংবাদ পাওয়া যায়নি।[১১]

৭ আগস্ট যখন ম্যাস মার্ডার উল্লেখ করা হচ্ছিল, ঠিক তখন আলজাজিরা জানিয়েছিল, হাসিনার পতনের পর তারা দুজন হিন্দু সম্প্রদায়ের নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়েছিল, এর মধ্যে একজন পুলিশ অফিসার এবং আরেকজন আওয়ামী লীগের কর্মী।

অজস্র মিথ্যা সংবাদে ভারতীয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সয়লাব হয়ে যায়। যেমন: আওয়ামী লীগের নেতা ক্রিকেটার মাশরাফির বাড়িতে আগুন দেওয়া হলে ভারতীয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেটিকে আরেক ক্রিকেটার লিটন দাসের বাড়িতে হামলা বলে প্রচার করে। তাতে লিটন দাসের হিন্দু পরিচয়কে টার্গেট করে প্রচারণা করা হয়।

এমনকি হিন্দু নারী ধর্ষণের সংবাদও ছড়িয়ে পড়ে সংবাদমাধ্যমে। একজন হিন্দু নারী সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন–এমন এক ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে টেলিগ্রামে। তাতে ক্যাপশনে লেখা হয়: The so-called Jamaat-e-Islami quota protesters leaked a video of the gang rape of a Hindu girl to the Islamic army group. If Hasina's government falls, they have threatened to rape all Hindu girls out of their homes. কিন্তু এ ভিডিয়ো আগে বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করা হয়েছে। ২০২৩ সালে ভারতের মণিপুরের একটি ঘটনায়ও এ ভিডিয়ো প্রচার করা হয়। ভিডিয়োটি ২০২১ সালে প্রথম ইন্দোনেশিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল।[১২]

৬ আগস্ট *টাইমস অব ইন্ডিয়া* বিজেপির একজন নেতার বরাত দিয়ে শিরোনাম করে, বাংলাদেশে হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে, প্রায় এক কোটি হিন্দু ভারতে প্রবেশ করতে পারে।[১৩] শুধু তাই নয়, কোনো কোনো হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের ওয়েবসাইটে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে ইসলামিক চরমপন্থিদের দ্বারা বাংলাদেশের হিন্দুরা 'জেনোসাইড'-এর শিকার হচ্ছে![১৪]

ThePrint

POLITICS GOVERNANCE ECONOMY DEFENCE INDIA GROUND REPORTS OPINION EVENTS VIDEO MORE

Politics

Jamaat may take control in Bangladesh, expect an influx of Hindus — BJP leaders after Hasina resigns

West Bengal Leader of Opposition Suvendu Adhikari calls on Mamata Banerjee's government to mentally prepare to give shelter to Hindu refugees from Bangladesh.

SREYASHI DEY 05 August, 2024 09:00 pm IST

Most Popular

Vestiges of British-era infra, 10 Mumbai rail overbridges to make way for newer, swankier ones

Marxism still sells in Modi's India. LeftWord Books is thriving

Chhattisgarh pvt hospitals are gaming Ayushman Bharat PMJAY. It's the state with 2nd highest frauds

The Print, Online
6 August 2024

ভারতীয় মিডিয়া নিহতদের হিন্দু পরিচয় নিয়ে রাজনীতি কেবল এখানেই শেষ করেনি। সম্প্রতি সীমান্তে স্বর্ণা দাশ নামে ১৪ বছরের এক কিশোরী বিএসএফ-এর গুলিতে নিহত হন। *টাইমস অব ইন্ডিয়া* এ সংবাদকে মিথ্যাভাবে প্রচার করে যে, দেশত্যাগ করার সময় স্বর্ণা দাশ বিজিবির গুলিতে নিহত হয়েছেন। সেখানে একেবারে উলটোভাবে পুরো ঘটনা প্রকাশ করা হয়:

> 'Reportedly, Swanra and her parents had been facing problems in Bangladesh since regime change. In the last three weeks, they attempted to cross over to Tripura thrice but failed...When they were attempting to cross the border near pillar No. 57 taking advantage of the absence of BSF at night, the BGB opened fire.'[১৫]

সংবাদের প্রতিবেদনে যে বর্ণনা হাজির করা হচ্ছে, এর মোদ্দা কথা হলো: হাসিনার পতনের পর হিন্দুরা তাঁদের বাড়িঘর ছেড়ে ভারতে আশ্রয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন; কিন্তু যখন সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছেন, তখন বিএসএফ-এর অনুপস্থিতিতে বিজিবিই নিজ দেশের নাগরিকদের গুলি চালিয়ে হত্যা করছে। এ সংবাদের শিরোনামে স্বর্ণা দাশের হিন্দু পরিচয়টিকেই ব্যবহার করা হয়, যেন মনে হবে স্বর্ণা দাশকে 'হিন্দু' হওয়ার জন্যই মারা হয়েছে। ভারতীয় মিডিয়ার বাংলাদেশবিরোধী সাম্প্রদায়িক প্রচারণা ও মিথ্যাচারের এক নিকৃষ্ট নজির হচ্ছে এই প্রতিবেদন। বিএসএফ কর্তৃক স্বর্ণা দাশকে হত্যা করার ঘটনায় ভারতীয় মিডিয়ার বয়ানে এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল লক্ষ করা যায়। এতকাল সীমান্ত হত্যা নিয়ে ভারত বাংলাদেশের নাগরিকদের বিমানবিকীকরণ (ডিহিউম্যানাইজেশন) করে এসেছে, তথা নিহতদেরই দোষারোপ করে এসেছে। আওয়ামী লীগও তা বরাবর কবুল করে এসেছে। সম্ভবত এবারই প্রথম সীমান্ত হত্যার দায় ভারতীয় মিডিয়া বিজিবির কাঁধে দিয়েছে এবং সেক্ষেত্রে স্বর্ণা দাশের হিন্দু পরিচয়ের ওপর ভর করেছে। হিন্দুত্রাতা সাজতে চাইলেও আদতে ভারতীয় রাষ্ট্র ও সংবাদমাধ্যম যে মূলত হিন্দু সেন্টিমেন্ট ব্যবহার করার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে সিদ্ধহস্ত, এ ঘটনায় তা স্পষ্ট।

আওয়ামী লীগ বনাম ইসলামপন্থি

ভারতের সংবাদমাধ্যমে বাংলাদেশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান এবং এর পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে যে ধরনের সংবাদ, প্রতিবেদন ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে তাতে কয়েকটি বিশেষ প্রবণতা ফুটে উঠেছে। এ প্রবণতাগুলো যেমন একদিকে বাংলাদেশের আপামর জনগোষ্ঠীর জন্য অপমানজনক, তেমনই তাঁদের এজেন্সি বা সক্রিয়তাকে পুরোদমে খারিজ করে। আমরা পরে দেখব আওয়ামী লীগের 'দৃশ্যমান' গণতন্ত্র থেকে পিছু হটার পেছনে ভারতের যে অবদান, তাতে এ ধরনের অপমানজনক দৃষ্টিভঙ্গির মতাদর্শিক ভূমিকা রয়েছে।

রংপুরের শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারী আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার পর জুলাইয়ের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়। আওয়ামী লীগ ও ভারতপন্থি ব্যক্তি/গোষ্ঠী ব্যতীত বাংলাদেশের প্রায় সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে নানাভাবে যোগ দেন। এ আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল অদলীয় শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফরম: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। স্বীকার করা ভালো, আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকলেও নেতৃত্বে ছিলেন পুরোপুরি শিক্ষার্থীরা। যদিও শিক্ষার্থী-হত্যার প্রতিবাদে বাংলাদেশের আপামরসাধারণ রাস্তায় নেমে এসেছিল; তবু এতে যদি রাজনৈতিক দলের সম্পৃক্ততা খুঁজতেই হয়, তাতে বিএনপি, গণতন্ত্র মঞ্চ, এবি পার্টিসহ বামপন্থিদের একাংশ, জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন দলের কর্মীরাও যুক্ত ছিলেন। কিন্তু কেউই রাজনৈতিক দলের ডাকে রাস্তায় নেমে আসেননি; এসেছিলেন শিক্ষার্থীদের ডাকে। দলীয় কর্মীরাও 'জনগণ' হয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হয়, এ বছরের (২০২৪ সাল) আওয়ামীবিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীরা তাঁদের দলীয় পরিচয়সহ

রাজপথে সরব উপস্থিত ছিলেন। নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিএনপির নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলো রাজপথে ছিল। কিন্তু পরাশক্তি (যুক্তরাষ্ট্র) ও স্যাংশননির্ভরতার দরুন জানুয়ারির আন্দোলন সফলতার মুখ দেখেনি। কাজেই বাংলাদেশের রাজনীতি জানুয়ারির স্যাংশন-পর্ব পেরিয়ে জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানপর্বে যখন প্রবেশ করল, রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মীরা যে দলীয় পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে এসে 'জনগণ'-এ পরিণত হয়েছিলেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করা চলে না।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম যখন এ সংবাদ প্রকাশ করে, তখন তারা এমনভাবে উপস্থাপন করে তাতে জামায়াতে ইসলামী বা ইসলামপন্থিদেরই আন্দোলনের প্রধান শক্তি হিসাবে হাজির করে। তাতে দেখা যায়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও পরিসর স্রেফ দুভাগে বিভক্ত: আওয়ামী লীগ বনাম জামায়াতে ইসলামী/ইসলামপন্থি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকা মানে অবধারিতভাবে ইসলামপন্থিদের ক্ষমতা দখল করা। ইসলামপন্থিরা ক্ষমতায় চলে আসবে–এই বয়ান ভারতের বাংলাদেশবিষয়ক পররাষ্ট্রনীতিতেও কার্যকর ছিল।

৬ আগস্ট *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া* 'What is Jamaat-e-Islami? 'Pakistan-backed' political party that brought down Sheikh Hasina govt in Bangladesh' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। সেখানে জামায়াতে ইসলামীর একাত্তরের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে দাবি করা হয়, পাকিস্তানি মদতপুষ্ট এ দলই হাসিনার পতন ঘটিয়েছে।[১৬] ভারতের *দ্য ইকোনমিক টাইমস* পাকিস্তানের আইএসআই ও চীনকে দায়ী করে বলে,

> 'Intelligence agencies have identified Pakistan's ISI and its Chinese patron as key players in agitating protests and subversion that compelled Bangladeshi leader Sheikh Hasina to flee the country. Information reveals the involvement of Islami Chhatra Shibir (ICS), the student wing of Jamaat-e-Islami Bangladesh, in converting protests over quotas into efforts to establish a regime favorable to Pakistan and China, undermining the previously installed Awami League government, as reported by TOI'.[১৭]

এখানেও বিভিন্ন অজানা সূত্রের বরাত দিয়ে জামায়াতে ইসলামী ও শিবিরকে আন্দোলনের প্রধান কৃতিত্ব দেওয়া হয়। সেখানে বলা হয়, এ বছরের শুরুতে আইএস মদতপুষ্ট জামায়াতে ইসলামী হাসিনা সরকারকে অস্থিতিশীল করে তোলার জন্য অর্থ সহায়তা পায়। একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তার বরাতে বলা হয়: 'The ultimate objective of Jamaat or ICS is to establish a Taliban-type govt in Bangladesh, and the ISI has been assuring them of their support in achieving this goal.'

একদিকে যেমন বলা হচ্ছে জামায়াতে ইসলামীই হাসিনার পতন ঘটিয়েছে, তেমনই দাবি করা হচ্ছে জামায়াতই ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রণ নেবে এবং এ কারণে হিন্দুদের দেশত্যাগে বাধ্য করা হবে। একজন বিজেপি নেতার বরাতে 'Jamaat may take control in Bangladesh, expect an influx of Hindus–BJP leaders after Hasina resigns' শিরোনামে সংবাদে বলা হয় :

> 'If this situation doesn't come under control within three days, mentally, be prepared to give refuge to one crore Hindu refugees. The Centre should inform the (Bengal) Governor and Chief Minister. There is CAA. If the situation is not controlled there, Jamaat (an opposition party in Bangladesh) and radicals will take control.'[১৮]

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীকে আওয়ামী লীগ বনাম ইসলামপন্থি–এ দুই বর্গের মধ্যে এঁটে ফেলার মাধ্যমে আসলে কয়েকটি ঘটনা ঘটে। প্রথমত, বাংলাদেশের পুরো জনগোষ্ঠীকে 'ইসলামপন্থি' হিসাবে তুলে ধরা হয়; যারা কি না গণতন্ত্র পেলে আওয়ামী লীগকে সরিয়ে 'ইসলামপন্থিদের' বসিয়ে দেবে। ফলে গণতন্ত্রের চেয়ে 'ইসলামপন্থি' ঠেকানো দিল্লির কাছে বেশি প্রয়োজনীয় কাজ হিসাবে দেখা দেয়। এর মাধ্যমে ভারতের বাংলাদেশবিষয়ক পররাষ্ট্রনীতির বৈধতাও হাসিল করা হয়। এ বয়ানের সঙ্গে আওয়ামী লীগের বয়ানের আদতে কোনো পার্থক্য নেই। দ্বিতীয়ত, এটি করা হয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিসরের জটিলতাকে সরল দুই বর্গে বিভক্ত করার মাধ্যমে। বিএনপির মতো একটি বৃহৎ দলের অস্তিত্বকে আমলে না নিয়ে অনেক ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল কেবল ইসলামপন্থি হওয়ার দরুন ভারতীয় মিডিয়ার মূল ফোকাসে থাকে।

এ ধরনের বয়ানের সবচেয়ে বড়ো নজির দেখা যায় ভারতের খ্যাতিমান স্কলার ও কলামিস্ট বিজয় প্রসাদের লেখায়ও। বাংলাদেশের মিশর-ভাগ্যবরণ নিয়ে তাঁর আশু শঙ্কাবিচলিত নিবন্ধ পড়ে হতাশ হতে হয় এ ভেবে যে, ভারতের একজন গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশকে আওয়ামী লীগ বনাম ইসলামিস্টের দ্বন্দ্বের বাইরে দেখতে পারেন না।[১৯] বাংলাদেশ ইসলামপন্থিদের উত্থান ও মিশর হয়ে যাওয়ার শঙ্কাজনিত সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছে যাচ্ছেন, অথচ এখানে যে বিএনপির মতো একটি রাজনৈতিক দলের, যারা কি না বামের ডান ও ডানের বাম অস্তিত্ব আছে, যাদের রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে, যেকোনো সময় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তারাই সম্ভাব্য বিজয়ী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী 'র‍্যাডিক্যাল' বুদ্ধিজীবী বিজয় প্রসাদ মহোদয় তা আমলেই নেন না। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 'পুলিশ স্টেশন' ইসরায়েলের এবং সেই সূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতায় বিজয় প্রসাদ বেশ সক্রিয়; তিনি প্রতিরোধী সংগঠন হামাসের সমব্যথীও বটে। কিন্তু তিনি দক্ষিণ এশিয়ায় দিল্লির সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষ ও তৎপরতা চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হন। বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার 'পশ্চিম তীর' বানাতে চাওয়ার ভারতীয় দুরভিসন্ধির ব্যাপারে বিজয় নীরব থাকেন। ফলে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দুনিয়ায় 'সাম্রাজ্যবাদবিরোধী' অ্যাক্টিভিস্টের খ্যাতি অর্জন করা বিজয় প্রসাদ বাংলাদেশ প্রশ্নে এসে দরবারি বুদ্ধিজীবীতে (Official Intellectual) পরিণত হন।

গণতন্ত্র থাকলে ইসলামপন্থিরা চলে আসবে এবং আওয়ামী লীগের বাইরে বাকিসব ইসলামপন্থি–ভারত রাষ্ট্রের এমন প্রবলেমেটিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে বিজয় যেতে পারেননি। কাদের মোল্লা ১৯৭১ সালে কতজন মেরেছেন, প্রবন্ধে তিনি সেই হিসাব দিয়েছেন, অথচ শেখ হাসিনা মাত্র ২০ দিনে এক হাজারের অধিক লোককে মেরে ফেললেন, সেটার উল্লেখ পর্যন্ত নেই। আওয়ামী লীগ নেতা ও কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিককে গ্রেফতার করা নিয়ে মন্তব্য করেছেন; বাংলাদেশের লিবারেলরা এ নিয়ে কোনো কথা বলছেন না, মানে তাঁদের লিবারেলবাদ আসলে রাজনৈতিক ঘটনা, নৈতিক নয়। আওয়ামী লীগ ১৫ বছরে পুরো সিভিল সোসাইটিকে কীভাবে সংকুচিত করে এমন অসহনীয় পর্যায়ে নিয়ে এসেছে, এর বিন্দুমাত্র আভাস তাঁর লেখায় নেই।

আওয়ামী বুদ্ধিজীবী, লিবারেল বা সাংবাদিক বা অ্যাক্টিভিস্টরা কীভাবে দিনের পর দিন গুম, খুন ও দুর্নীতিকে জাস্টিফাই করে এসেছেন, তা নিয়েও কোনো টুঁ শব্দ নেই। এখন যারা গ্রেফতার হচ্ছেন, তাঁরা সবাই যে গত জুলাই ম্যাসাকারের সঙ্গে জড়িত অথবা এর উসকানিদাতা, তা সবাই জানেন। ১৫ বছর ধরে সরকারি সব গুম-খুনকেও তাঁরা জায়েজ করে আসছেন। তবু এ পরিস্থিতিতেও যখন তাঁদের আদালতপাড়ায় হামলা করা হচ্ছে বা হয়রানিমূলক মামলা দেওয়া হচ্ছে, তখন খোদ বাংলাদেশের ভেতরেই লেখালেখি ও প্রতিবাদ হচ্ছে। অথচ বিজয় প্রসাদ এর কিছুই দেখেন না। বাংলাদেশকে কেবল ভারতীয় দরবারি বয়ান এবং আওয়ামী-ইতিহাস/চোখ দিয়ে দেখলে যে ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কথা; বিজয় প্রসাদ সেখানেই পৌঁছেছেন।

হয়েছে। তখন বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেছিলেন, এ সংখ্যা আরও বেশি হবে। ২০১৩ থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত আসকের হিসাব অনুযায়ী, সংখ্যালঘুদের মন্দির, পূজামণ্ডপ বা মূর্তিতে ১ হাজার ৮৭৯টি হামলার ঘটনা ঘটেছে; ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান ও বাড়িঘরে ২ হাজার ১৯০টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। আহত হয়েছেন ৯৫৮ জন।[২০]

এমনকি রানা দাশগুপ্ত ২০২১ সালেই স্বীকার করেছেন, আওয়ামী লীগ আসার পর তারা ভেবেছিলেন, হামলা কমবে বা বন্ধ হবে, আদতে সেটা বৃদ্ধি পেয়েছে।[২১] আওয়ামী লীগ আমলে প্রায় প্রতিটি আক্রমণেই দলটির নেতাকর্মীরা জড়িত ছিলেন। তাঁরা যেমন তাঁদের অন্তর্কোন্দলের বলি বানিয়েছেন হিন্দু ও সংখ্যালঘুদের, তেমনই 'তৌহিদি জনতা' নামক মব তৈরিতেও ছিলেন সমান সক্রিয়। একইভাবে সংখ্যালঘুদের

> ভারতীয় সংবাদমাধ্যম যখন এ সংবাদ প্রকাশ করে, তখন তারা এমনভাবে উপস্থাপন করে তাতে জামায়াতে ইসলামী বা ইসলামপন্থিদেরই আন্দোলনের প্রধান শক্তি হিসাবে হাজির করে। তাতে দেখা যায়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও পরিসর স্রেফ দুভাগে বিভক্ত: আওয়ামী লীগ বনাম জামায়াতে ইসলামী/ইসলামপন্থি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকা মানে অবধারিতভাবে ইসলামপন্থিদের ক্ষমতা দখল করা

সংখ্যালঘুর ত্রাণকর্তা

গণ-অভ্যুত্থানকে 'ইসলামপন্থি' বা জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন হিসাবে হাজির করা বা হাসিনার পতনের মূল কুশীলব হিসাবে তাঁদের হাজির করার পর অনিবার্য যুক্তি হচ্ছে–এবার হিন্দু তথা সংখ্যালঘুরা বিপদে পড়ে যাবেন। আওয়ামী লীগ না থাকলে হিন্দু জনগোষ্ঠী খতরনাক হালতে পড়ে যাবে বা ইতোমধ্যেই পড়ে গেছে–এমন বয়ান ভারতের মিডিয়াপাড়ায় খুব জোরেশোরে চলছে। এ বয়ানের ভেতরে যেমন একদিকে বাংলাদেশকে একটি 'মৌলবাদী' দেশ হিসাবে তুলে ধরা হয়, তেমনই আওয়ামী লীগকে হিন্দু জনগোষ্ঠীর 'ত্রাণকর্তা' বা বন্ধুরূপে তুলে ধরা হয়। ভারতের মিডিয়ায় সর্বাধিক প্রতিবেদন এলে প্রকাশিত হয় সংখ্যালঘু বা হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়ে। সেখানে হিন্দুরা খতরনাক পরিস্থিতিতে পড়েছেন, এটা বলতে গিয়ে তারা আদতে হাসিনা আমলের সংখ্যালঘুর পরিস্থিতিকে স্রেফ আড়াল করে রাখেন।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র তার সংখ্যালঘুদের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছে না, এ ব্যাপারে পাঁড় সাম্প্রদায়িক ঘরানার ব্যক্তি ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক পক্ষই অস্বীকার করে না। হিন্দু ধর্মাবলম্বী থেকে শুরু করে সাঁওতাল, আহমাদিয়া পর্যন্ত সব বর্গের 'সংখ্যালঘু' নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে ভারত ও বাংলাদেশের আওয়ামী কালচারাল ইন্ডাস্ট্রি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাসংক্রান্ত তোড়জোড়ে আওয়ামী লীগকে 'হিন্দুদের উদ্ধারকর্তা' বা 'বন্ধু' হিসাবে হাজির করার যে জোর প্রচেষ্টা চলছে, আমাদের আপত্তি এখানেই। এটি ধরতে পারা গুরুতর। এটি ধরতে না পারলে বোঝা যাবে না কীভাবে 'ত্রাতা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে সবচেয়ে নোংরা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আওয়ামী লীগই করে যাচ্ছে। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে, তাঁদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে, উপরন্তু মৌলবাদের জুজুর ভয় দেখিয়ে আওয়ামী লীগ এক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বহাল রাখছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র ২০২১ সালে জানিয়েছিল, ২০১৩ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ৯ বছরে হিন্দুদের ওপর ৩ হাজার ৬৭৯ হামলা ওপর যারা হামলা করেছেন, এসব চিহ্নিত লোককে তাঁরা মনোয়ন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। তবে কখনো কখনো ফেসবুকে সমালোচনা শুরু হলে সেটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন। আবার হামলায় আওয়ামী লীগ ও প্রশাসনের সক্রিয়তা এবং বিচার কার্যক্রমে তাঁদের নিষ্ক্রিয়তা বিভিন্ন ঘটনায় দেখা যায়। এটিও উল্লেখ করা জরুরি, আবুল বারাকাতের মতো চিহ্নিত আওয়ামী গবেষকরাই দেখিয়েছেন, স্বাধীনতার পর হিন্দু জনগোষ্ঠীর বসতভিটা সবচেয়ে বেশি যাঁরা দখল করেছেন, তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয় হচ্ছে 'আওয়ামী লীগ'।

অর্থাৎ, আওয়ামী লীগ একদিকে ১৫ বছর ধরে হিন্দু ও সংখ্যালঘুদের ওপর সর্বাধিক নিপীড়ন চালিয়েছে, প্রত্যেক নিপীড়নের পর সেটার দায় চাপিয়েছে জনগণের কাঁধে, জনগণকে 'মৌলবাদী' বানানোর পাঁয়তারা করেছে এবং সেই 'মৌলবাদ'-এর ভয় হিন্দু জনগোষ্ঠীর ভেতর সংক্রমণ করার চেষ্টা অব্যাহত রেখে আবার তাঁদের 'ত্রাতা' সাজার ভান করেছে। সোজা ভাষায়, এ হচ্ছে সংখ্যালঘুদের নিয়ে আওয়ামী লীগের নোংরা রাজনীতির ছক। দিল্লি ও আওয়ামী লীগের এই হচ্ছে সবচেয়ে নোংরা ছক বা পরিকল্পনা। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বাধীন কর্তাসত্তা ও দেশপ্রেমের ব্যাপারে মারাত্মক ধরনের অবজ্ঞা থাকলেই কেবল এমন পরিকল্পনা করা যায়।

ভারত রাষ্ট্রের নীতি

ভারতীয় মিডিয়ায় এ অভ্যুত্থানসংক্রান্ত সংবাদ ও প্রতিবেদনে যে কটি প্রবণতা ধরা পড়েছে, তা থেকে স্পষ্ট যে এটি ভারত রাষ্ট্রের দীর্ঘদিন বাংলাদেশবিষয়ক নীতিরই বহিঃপ্রকাশ। হাসিনার পতনের পরপর ভারতের বিরোধী দলীয় নেতা রাহুল গান্ধী পর্যন্ত এ আন্দোলনে পাকিস্তানের 'ইন্ধন' আছে কি না, তা খতিয়ে দেখার কথা বলেছেন। বাংলাদেশের জনগণকে আওয়ামী লীগ বনাম ইসলামপন্থি হিসাবে দেখানোর পাঁয়তারা এবং এটিকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখার রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ছক দিল্লির পুরোনো নীতি।

সংসদ ভবন এলাকা, ৫ আগস্ট ২০২৪।
ছবি: কবির হোসেন, সূত্র: প্রথম আলো

শেখ হাসিনার ক্ষমতায় থাকা এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্র গায়েব হওয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ইতিহাসের মধ্যে এর হদিস মিলবে। ভারত-বাংলাদেশের অসম চুক্তি ও সম্পর্কের কথা আমরা সবাই বারবার বললেও হাসিনা ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাদের সখ্য আরও গভীর। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনতে ভারত যে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল, সেটি প্রণব মুখার্জির ভাষ্য থেকে জানা যায়। তখনকার সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদ উদ্‌বিগ্ন ছিলেন, হাসিনা মুক্তি পাওয়ার পর তাঁকে বরখাস্ত করবেন কি না। প্রণব মুখার্জি তাঁর আত্মজীবনী 'কোয়ালিশন ইয়ার্স'-এ জানাচ্ছেন, তিনি নিজেই দায়িত্ব দিয়ে আশ্বস্ত করেছিলেন, হাসিনা ক্ষমতায় গেলে তিনিও টিকে থাকবেন।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ভারতের নিরাপত্তাজনিত উদ্‌বেগকে আমলে নিয়ে ভারতকেন্দ্রিক বিদ্রোহী দলগুলোকে ভেঙে দিয়েছিল এবং বিদ্রোহী ও আঞ্চলিক 'সন্ত্রাসী' দলের সদস্যদের ভারতের কাছে হস্তান্তরও করেছিল। উলফার বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। এটি ঘটেছিল যখন ভারতে ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস।

২০১৪ সালের নির্বাচন যখন বিরোধী দলগুলো বর্জনের হুমকি দেয়, তখন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা রাষ্ট্রের মধ্যে কিছুটা উদ্‌বেগ দেখা দেয়, যদিও ততদিন ভারতের সঙ্গে তাল মিলিয়েই তারা চলছিল। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তখন যুক্তরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়েছিল, তারা যেন ভারতের চোখ দিয়ে বাংলাদেশকে দেখে। বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের বোঝাপড়া যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভালো হবে।

আওয়ামী লীগ যখন বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ছাড়া নির্বাচন আয়োজন অব্যাহত রাখে, তখন ভারত তাতে অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং তখন বাংলাদেশ সফর করে জাতীয় পার্টির নেতা এরশাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এরশাদের দল তখন পর্যন্ত নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু সুজাতা সিং-এর বৈঠকের পর এরশাদ মত বদলান। এরশাদ বৈঠক শেষে ঘোষণা করেন, 'ওনারা বলেছেন, নির্বাচন করুন। আমি নির্বাচন না করলে নাকি জামায়াত-শিবিরের মতো মৌলবাদী শক্তি ক্ষমতায় আসবে।' এরশাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ নির্বাচনে বিরোধী দল আছে, তা দেখানোর মওকা পেয়ে যায় আওয়ামী লীগ। ওই নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাচনের ধারা অনিশ্চয়তার টানেলে ঢুকে পড়ে।[২২]

এরপর দিল্লির মসনদে কংগ্রেসের স্থলে বিজেপি এলেও মসনদের সঙ্গে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের সম্পর্ক আগের মতোই থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে আরও বেশি অসাম্য তৈরি হয়। ভারতের রাজনীতিকরা যখন বাংলাদেশকে নিয়ে একের পর এক অবমাননাকর ও বর্ণবাদী বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন প্রতিক্রিয়া দেখানো দূরে থাক, বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দুই দেশের সম্পর্ককে 'স্বামী-স্ত্রীর' বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি তো খোলামেলা স্বীকার করেন, যেকোনো মূল্যে হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখার অনুরোধ নাকি তিনি ভারতের কাছে করেছেন।

২০২৪ সালের ডামি নির্বাচনের আগে যখন ওয়াশিংটন বারবার সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য চাপ দিচ্ছিল, তখন ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। সম্প্রতি (১৫ আগস্ট) ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, ভারত নাকি তখন বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হবে বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিয়ে বেশি কথাবার্তা না বলা। কারণ, তাতে নাকি ইসলামপন্থিদের উর্বর ভূমি হয়ে উঠবে বাংলাদেশ, এবং ভারতের জন্য তা হুমকিস্বরূপ।[২৩]

এরপর আমরা দেখেছি, ওবায়দুল কাদের থেকে শুরু করে লীগের নেতারা খোলামেলা স্বীকার করছেন, তলে তলে চুক্তি হয়ে গেছে। বিএনপি যখন নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করছিল, তখন ভারত পাশে দাঁড়িয়েছে। এমনকি একজন প্রার্থী তো ঘোষণাই করেছিলেন, আমি হাসিনার প্রার্থী। আমি ভারতের প্রার্থী।[২৪]

ফলে ২০০৮ থেকে ২০২৪ সালের নির্বাচনের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাচ্ছে, দিল্লির প্রধান ঘুঁটি ছিলেন হাসিনা। যেভাবেই হোক তারা হাসিনাকে ধরে রাখতে চেয়েছে।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের এ যাত্রায় যে ধরনের বয়ান বা ন্যারেটিভ দেখা যাচ্ছে, সেটি ভারতের মিডিয়ার সাম্প্রতিক

সংবাদেও দেখা গেছে। উল্লিখিত প্রতিটি ন্যারেটিভ একে অপরের সঙ্গে জড়িত হয়ে ভারতের বাংলাদেশবিষয়ক মূলধারার বয়ান তৈরি করেছে। যেমন: ২০১৪ সালে যখন এরশাদকে রাজি করানো হচ্ছে বা ২০২৪ সালে যখন যুক্তরাষ্ট্রকে চাপ দেওয়া হচ্ছে, ভারত বারংবার সবাইকে ইসলামপন্থিদের ভয়/জুজু দেখিয়েছে।

অর্থাৎ সহজ কথা হচ্ছে, বাংলাদেশে যদি গণতন্ত্র থাকে, তাহলে মৌলবাদীরা ক্ষমতায় চলে আসবে। ফলে এ জুজুকে রুখতে হলে হাসিনার মতো ফ্যাসিস্টকেই সমর্থন দেওয়া লাগবে। ভারত ও আওয়ামী লীগের এ দৃষ্টিভঙ্গি যে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের জন্য কতটা অপমানজনক, তা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশের নাগরিকমাত্রই তাদের কাছে 'মৌলবাদী'। গণতন্ত্রের জন্য 'আনফিট'। ফলে গণতন্ত্রের চেয়ে তাদের কাছে 'মৌলবাদ' দমন করা বেশি জরুরি কাজ ছিল। এ রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতি আওয়ামী লীগের এ দৃষ্টিভঙ্গি আরও প্রকট আকারে হাজির হয় হাসিনার পতনের পর। ভারতের মিডিয়া, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী এবং পতিত স্বৈরাচার–সবাই সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ নিয়ে যে বিষাক্ত প্রোপাগান্ডামূলক রাজনীতিতে নেমে পড়ল, এর পটভূমিতে রয়েছে বাংলাদেশের আপামর জনগোষ্ঠীকে 'মৌলবাদী' ঠাহর করা এবং গণতন্ত্রের জন্য 'আনফিট' বিবেচনা করা। এ ন্যারেটিভ একটু ভিন্ন মোড়কে হাজির হয়েছে সম্প্রতি 'Mobs are still calling the shots in Bangladesh. Yunus government appears weak to act' শিরোনামের এক প্রতিবেদনে। সেখানে গত এক মাসে গণ-অভ্যুত্থানের সরকারের সমালোচনা করে বলা হয়, 'A dysfunctional State is more dangerous than dysfunctional democracy.'[২৫] শেখ হাসিনা সরকার বাংলাদেশকে যেখানে রেখে গেছে, যেভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জনগণের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে অকার্যকর বানিয়ে রেখে গেছে, সেখানে তা ঠিকঠাক করতে ন্যূনতম যে সময় দরকার, তা দিতেও ওই নিবন্ধকার রাজি নন। তাঁর প্রদত্ত তথ্যগুলো সঠিক। কিন্তু প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ক্রিয় অবস্থায় জনগণ যেভাবে নানাবিধ অস্থিতিশীল উপাদানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে, এর কোনো উল্লেখ নেই ওই নিবন্ধে। বরং নিবন্ধকার মাত্র এক মাসের ব্যবধানে, অকার্যকর রাষ্ট্রের চেয়ে অকার্যকর গণতন্ত্র ভালো রায় দিয়ে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত সরকারের চেয়ে হাসিনা সরকারই ভালো–এমন অভিমত উৎপাদনে সচেষ্ট হয়েছেন।

আন্দোলনকারী নেতৃত্বকে বিতর্কিত করার মাধ্যমে গণ-অভ্যুত্থানকে বিতর্কিত করার চেষ্টা

দিল্লি এস্টাবলিশমেন্টের কাছে বাংলাদেশ ভারতের 'নিরাপত্তা উদ্‌বেগ' (সিকিউরিটি কনসার্ন) ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ, স্বতন্ত্র রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসাবে বাংলাদেশের নিজস্ব ঐতিহাসিক ঘাত-প্রতিঘাতের কোনো মূল্য নেই; বাংলাদেশ ভারতের জন্য নিরাপত্তা উদ্‌বেগ তৈরি করছে কি না, সেটাই বিবেচ্য। বাংলাদেশকে তিনদিক থেকে কাঁটাতারে ঘেরাও করে রাখার পেছনে এ মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল। একটা স্বভাবতই 'জঙ্গি' জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ ও কনটেইন করতে হলে সেখানে এমন শাসক বসাতে হবে, যারা দিল্লির বশংবদ হয়ে থাকবে। এ প্রসঙ্গে আমরা একটু পরে আলাপ করব।

এ পর্যায়ের জন্য খেয়াল করার মতো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, যখনই দিল্লির অনুগত অবৈধ শাসক শেখ হাসিনার পতন ঘটেছে, ভারতীয় মিডিয়া নানাভাবে বলার চেষ্টা করেছে, বাংলাদেশে ইসলামিক 'জঙ্গিবাদীদের' উত্থান ঘটেছে। Islamic Surge in Bangladesh Indian Media লিখে গুগলে সার্চ করলে এ প্রসঙ্গে অসংখ্য ভারতীয় সংবাদ নজরে আসে। *দ্য হিন্দু* পত্রিকা তসলিমা নাসরিনের বরাতে জানিয়েছে, বাংলাদেশের জঙ্গিগোষ্ঠী বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানাতে চায়।[২৬]

এ প্রচারণার উৎস কিন্তু সেই 'নিরাপত্তা উদ্‌বেগ'। কাজেই ভারতীয় মিডিয়া (তন্মধ্যে *দি ইকোনমিক টাইমস* ও *আনন্দবাজার* উল্লেখযোগ্য) ছাত্র নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ কুশীলব এবং বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলমকে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন হিযবুত তাহ্‌রীরের নেতা হিসাবে মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে।[২৭] অর্থাৎ, বাংলাদেশে ইসলামিক র‍্যাডিক্যালদের উত্থান ঘটেছে ব্যাপার শুধু এতেই সীমাবদ্ধ নয়; তারা খোদ রাষ্ট্রক্ষমতায় আছে–এ প্রচারণা প্রতিষ্ঠিত করাই ভারতীয় মিডিয়ার উদ্দেশ্য। তাতে ভারতীয় 'নিরাপত্তা উদ্‌বেগ' যুক্তি আরও পোক্ত হয়।

শেষ কথা

বাংলাদেশের জনগণের বৃহৎ এক অংশ মনে করে, দিল্লি বাংলাদেশকে তার উপনিবেশ বানাতে চায়। জনপরিসরে এমন ধারণা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক (কিছু ক্ষেত্রে বিপজ্জনক); কিন্তু এটা অনেকাংশেই সত্য। কিন্তু এই 'উপনিবেশের' ধরনটা পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার। এটিকে আমরা নানা সময়ে 'জিওগ্রাফি মাইনাস ডেমোগ্রাফি' অভিহিত করেছি। এখানে তা ব্যাখ্যা করা যাক। ভারত রাষ্ট্রের বাংলাদেশ নীতি বুঝতে হলে এ ধারণাটা বোঝা দরকার।

ভারত ও বাংলাদেশের কর্তাব্যক্তিদের নানা সময়ের কথাবার্তায় দিল্লির এই অভিলাষ আর গোপন থাকেনি। কী কংগ্রেস, কী বিজেপি–তারা বাংলাদেশের জন্য আওয়ামী লীগকে বেছে নেওয়াকেই বেহতর মনে করে। কিন্তু কোনো বুদ্ধিমান ও বিবেচক দেশেরই সব ডিম এক বাস্কেটে রাখা উচিত না। আমরা আগে একবার উল্লেখ করেছি, প্রণব মুখার্জি তাঁর স্মৃতিকথা 'Coalition Years'-এ কোনো রকম রাখঢাক ছাড়াই লিখেছেন ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনার জন্য তিনি কী ভূমিকা রেখেছিলেন। তবু ২০০৮ সালের নির্বাচন মোটা দাগে সুষ্ঠু নির্বাচনই ছিল। অন্তত মানুষ ভোট দিতে পেরেছিল। কিন্তু এর পরের তিনটি নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ ভোটাধিকারই প্রয়োগ করতে পারেনি। ২০১৪ সালে বিএনপির মধ্যে একটা ধারণা ছিল যে যেহেতু কংগ্রেস=আওয়ামী লীগ; কাজেই বিজেপি=বিএনপি হবে। তাদের সেই আশা নিরাশায় পরিণত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, আওয়ামী লীগকে যেনতেন উপায়ে ক্ষমতায় রাখতে বিজেপি কংগ্রেসের চেয়েও বেপরোয়া।

সর্বশেষ ২০২৪ সালের নির্বাচন যেন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়, সেজন্য আওয়ামী লীগকে যুক্তরাষ্ট্র কিছু চাপ প্রয়োগ করেছিল। এর পেছনে এ অঞ্চলে তাদের ভূরাজনৈতিক বিবেচনাই ছিল প্রধান। তবু বাংলাদেশের মানুষ আশায় বুক বেঁধেছিল, এবার হয়তো তাঁরা ভোট দিতে পারবে। কিন্তু এবারও বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে দিল্লিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২+২ সামিটে বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে 'কনটেইন' করেছে বলে জোর গুঞ্জন আছে। অর্থাৎ, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ভোট ছাড়া ক্ষমতায় থাকলেই ভারত ও আমেরিকার স্বার্থ রক্ষিত হবে বলে ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝাতে সক্ষম হয়। ফলে আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যাকফুটে যেতে দেখেছি। এ নিয়ে ভারতের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিও বাংলাদেশের সমাজে ন্যায্য ক্ষোভ আছে।

গত ৭ জানুয়ারির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রকে 'কনটেইন' করতে পারাকে ইন্ডিয়ান পলিসি মেকাররা তাঁদের বড়ো কূটনৈতিক

'অর্জন' হিসাবে দেখে থাকে। অবশ্য ১৬ জুলাইয়ের পর বাংলাদেশের মানুষের কাছে এসব অপ্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশের জনগণ এখন নিজের শক্তি ও কর্তাসত্তায় (Agency) বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। এতে ইন্ডিয়ার ভীত হওয়া উচিত নয়। ইসরায়েলের কাছে যেমন ফিলিস্তিনি মাত্রই 'সন্ত্রাসী'; বাংলাদেশিদের ব্যাপারে একই মানসিকতা পরিহার করে দরদ দিয়ে এ দুঃখী জনগোষ্ঠীকে বুঝতে চাইলে আখেরে ভারতই লাভবান হবে। 'গায়ে মানে না আপনি মোড়ল' মনোভাব ছাড়তে পারলে ভারত স্বয়ংক্রিয়ভাবেই দক্ষিণ এশিয়ার স্বাভাবিক নেতা হতে পারবে। কিন্তু সেজন্য দাদাগিরি মনোভাব ছাড়তে হবে।

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের বাইরে বাকি সব পক্ষই জঙ্গি/মৌলবাদী–এ প্রচারণা ও ভাবমূর্তি ভারতে কতটা প্রবল, তা বোঝানোর জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে* এক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, যার শিরোনাম এমন: 'Bangladesh Elections tug of War: Islamic Fundamentalism vs Democracy'; ওই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কেন আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচন বয়কট করেছে, তা বুঝতে না চেয়ে উলটো দাবি করা হয়–আওয়ামী লীগের অধীনে যেনতেন উপায়ে একটা ডামি নির্বাচন করে ফেলাই (খোদ আওয়ামী লীগাররা গত নির্বাচনকে 'ডামি নির্বাচন' বলে থাকেন) 'গণতন্ত্র'। আর যাঁরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের দাবিতে এ ধরনের তামাশার নির্বাচনের বিরোধিতা করছে, তাঁরা নাকি 'ইসলামিক মৌলবাদী'। অর্থাৎ, আওয়ামী লীগের নির্বাচন ডাকাতির বিরোধিতা করলেই আপনি 'ইসলামিক মৌলবাদী'। এ যুক্তি মোতাবেক আওয়ামী ফ্যাসিবাদবিরোধী একজন বাংলাদেশি হিন্দুও 'ইসলামিক মৌলবাদী'। অদ্ভুত যুক্তিই বটে!

স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক হবে বাংলাদেশের সংবিধানে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান ছিল। ২০০৮ সালে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটির জোরে সংবিধান থেকে এ বিধান বাতিল করে দেয়। এখানে দুটি দিক খেয়াল রাখতে হবে। এক. সংসদে (Parliament) মোট আসনের দুই-তৃতীয়াংশ থাকা মানেই কিন্তু আপনি মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাননি। বাংলাদেশের নির্বাচনের পরিসংখ্যান ও ইতিহাস বলছে, ১৯৯০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কোনো দলই মোট প্রদত্ত ভোটের ৪০ ভাগের বেশি ভোট কখনোই পায়নি। কিন্তু সংসদীয় আসনের মারপ্যাঁচে তারা 'মেজরিটি' বনে যাচ্ছে এবং সংবিধানের ইচ্ছামতো কাটাছেঁড়া করছে। দুই. সর্বোচ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও সংবিধান সংশোধনের এখতিয়ার সংসদের কাছে থাকা উচিত নয়। কারণ, সংবিধান হচ্ছে জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের লিখিত দলিল। আর সংসদ জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের প্রতিনিধি। ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের প্রতিনিধিত্ব করে এমন হাউজের (অর্থাৎ সংসদ) কাছে খোদ ইচ্ছা ও অভিপ্রায় বদলে দেওয়ার কিংবা কাটাছেঁড়া করার এখতিয়ার থাকা উচিত নয়। এটা গুরুতর রাষ্ট্রনৈতিক ও দার্শনিক বিতর্ক। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দলগুলো এসব গুরুতর প্রশ্নের ব্যাপারে সংবেদনশীল নয়। যাই হোক, এ কারণে সংসদ কর্তৃক সংবিধান কাটাছেঁড়াকে আমাদের দেশের অনেক বিশেষজ্ঞ 'অসাংবিধানিক' (Unconstitutional) হিসাবে অভিহিত করে থাকেন। এসব তর্কবিতর্ক আমাদের সমাজে উঠেছে বলেই রাষ্ট্র সংস্কার, গণপরিষদ নির্বাচন আহ্বানের মতো দাবি ক্রমশ অনিবার্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এগুলোকে বলপ্রয়োগ করে আর দমিয়ে রাখা যাবে না।

ইন্ডিয়ান র‍্যাডিক্যাল সিভিল সোসাইটি, বুদ্ধিজীবী সমাজ, ফ্যাসিবাদবিরোধী অ্যাক্টিভিস্ট ও শিক্ষার্থী-সমাজ এবং সর্বোপরি ভারতীয় জনগণের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। আমরা আশা করি, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে তাঁরা বিজেপি সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখবে। এবারের চলমান ঘটনাবলির সময়ও পশ্চিমবাংলার হিন্দুত্ববাদী এক টেলিভিশন চ্যানেলে ভারত হাসিনা সরকারকে 'রক্ষা' করতে 'শান্তিসেনা' পাঠাবে কি না–এমন আলোচনা লক্ষ করা গেছে। এর ফলে বাংলাদেশের সমাজে চাপা গুঞ্জন ও ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে। এটি উভয় দেশের জন্যই বিপজ্জনক। এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে উভয় দেশের জনগণের মধ্যে বোঝাপড়া প্রয়োজন। ক্ষমতার স্বার্থে দিল্লির বিপজ্জনক নীলনকশা ভেস্তে দিতে হলে দুই দেশের জনগণ ও সিভিল সোসাইটি পর্যায়ে ঐক্য প্রয়োজন।

> বাংলাদেশকে স্রেফ নিরাপত্তা লেন্সের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রকে 'মুসলমান অধ্যুষিত সম্ভাব্য জঙ্গি/সন্ত্রাসী'–এহেন বর্ণবাদী নীতিতে বিচার করলে আখেরে ভারতেরই ক্ষতি

বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার 'পশ্চিম তীর' (West Bank) হতে চায় না। ইসরায়েল যেমন পশ্চিম তীরে জিওগ্রাফি মাইনাস ডেমোগ্রাফি প্রকল্প এগিয়ে নিচ্ছে, তেমন কাছাকাছি কিছু এখানে ঘটলে এর পরিণতি খুব ভয়াবহ হতে পারে। ইসরায়েল পশ্চিম তীর ও গাজার ভূখণ্ড চায়; কিন্তু ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীকে চায় না; ফলে অসলো চুক্তির মধ্য দিয়ে এমন একটা বন্দোবস্ত ইসরায়েল করেছে, যার দরুন পশ্চিম তীরের দৈনন্দিন বেসামরিক প্রশাসনিক কাজ নির্বাহ করবে ইসরায়েল মনোনীত ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ (Palestine Authority); অন্যদিকে পশ্চিম তীরের জলস্থল-অন্তরিক্ষের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ তথা সার্বভৌমত্ব থাকবে ইসরায়েলের হাতে। তাতে জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন দেখভালের বোঝাও বহন করতে হবে না; কিন্তু ফিলিস্তিন ভূমির কার্যকর নিয়ন্ত্রণও নিজেদের হাতে রাখা যাবে। এটিকেই আমি বলছি 'জিওগ্রাফি মাইনাস ডেমোগ্রাফি'। ৩৭০ ধারা বাতিল করার দরুন কাশ্মীরে ভারতের উপস্থিতিকে অনেকেই 'ঔপনিবেশিক' বলছেন।[২৮] কাশ্মীরকে দক্ষিণ এশিয়ার 'প্যালেস্টাইন' বলার নজিরও আছে। জায়নবাদীদের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদীদের মতাদর্শিক ও সামরিক সখ্য সম্পর্কে সারা দুনিয়ার মানুষ অবগত। ভারত ইসরায়েলি অস্ত্রশস্ত্র ও নজরদারি যন্ত্রপাতির সবচেয়ে বড়ো ক্রেতা। ইসরায়েলের মোট অস্ত্র রপ্তানির অর্ধেক ভারত একাই ক্রয় করে থাকে।

ভারত কখনো বাংলাদেশকে সরাসরি দখল করতে চাইবে, আমার তা মনে হয় না। তবে যে 'জিওগ্রাফি মাইনাস ডেমোগ্রাফি'র কথা বললাম, তা এখানে কার্যকর রয়েছে–এমন নানা আলামত

আমরা টের পাচ্ছি। এ কারণে বাংলাদেশের ছাত্ররা আন্দোলনের সময় দেওয়ালে লিখেছে 'পিন্ডির গোলামি ছিন্ন করেছি, দিল্লির দাসত্ব করার জন্য নয়'। এটি কিন্তু কোনো ইসলামপন্থিদের দেওয়াললিখন নয়; বাংলাদেশের বামপন্থি ছাত্র সংগঠনগুলোই এরকম লিখছে। ভারতের নীতিনির্ধারকদের বাংলাদেশিদের এ অনুভূতিকে আমলে নিতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, এক্ষেত্রে ভারতের র‍্যাডিক্যাল গণতান্ত্রিক ধারার জনগণকে বাংলাদেশ পাশে পাবে। প্রতিবেশী দেশের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক বিকাশের পথে বাধা হয়ে নিজ দেশের গণতন্ত্র অর্জনেও সুবিধা করা যায় না–ভারতের জনগণ তার রাষ্ট্রকে এটা মেনে নিতে বাধ্য করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে সমমর্যাদার ভিত্তিতে শান্তি ও স্থিতিশীলতা কামনা করে।

বাংলাদেশকে স্রেফ নিরাপত্তা লেন্সের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রকে 'মুসলমান অধ্যুষিত সম্ভাব্য জঙ্গি/সন্ত্রাসী'–এহেন বর্ণবাদী নীতিতে বিচার করলে আখেরে ভারতেরই ক্ষতি। মুসলমানরা স্বভাবতই 'জঙ্গি' মানসিকতার, তাই তাঁদের মধ্য থেকে অনুগত 'সেক্যুলার' ব্যবস্থাপক (আওয়ামী লীগ) খুঁজে নেওয়া এবং তাঁদের যেনতেন কায়দায় ক্ষমতায় রাখা কোনো রাষ্ট্রের (ভারত) কূটনৈতিক নীতি হতে পারে না। মুসলমানরা 'সেক্যুলার' হতে পারে না; তবে তাঁদের মধ্য থেকে 'সেক্যুলার' শাসক বের করা সম্ভব, যাঁরা নিজ জনগোষ্ঠীকে দমন করে রাখবে–এর পেছনে এমন অনুমানও ক্রিয়াশীল। জুলাই অভ্যুত্থানের ভারতীয় মিডিয়ার সংবাদ পরিবেশন ভারতীয় রাষ্ট্রের 'বাংলাদেশ সমস্যা'র উপসর্গ মাত্র।

তথ্যসূত্র

১. 'The daughter of the country's founding father Sheikh Mujibur Rahman, who led Bangladesh's independence from Pakistan, Hasina has been credited with turning around the economy and the massive garments industry. But the economy has also slowed sharply since the Russia-Ukraine war pushed up prices of fuel and food imports, forcing Bangladesh to turn last year to the International Monetary Fund for a $4.7 billion bailout.' Paul, Ruma, and Tora Agarwala. 'Bangladesh Protests Quelled but Anger, Discontent Remain.' *The Print*, July 26, 2024.

২. 'As is evident from the current quota protests on Dhaka's streets, Bangladeshi youth do not dig their 1971 origin story in the way previous generations did. By extension, many today are dismissive of the role the Indian Army played in helping Bangladesh become an independent nation. Pakistan Army's 1971 ethnic cleansing in the country has also been largely forgotten, with the average Bangladeshi youth more inclined to cheer for the Pakistan cricket team in a match than India..' Halder, Deep. 'Are Bangladesh Youth Done with 1971 Legacy? Anti-Quota Student Protests Question Old Ideas.' *The Print*, July 10, 2024.

৩. Halder, Deep. 'Bangladesh Anti-Quota Protests Now Out of Control–'Razakar' vs Dictator Debate Has Split Nation.' *The Print*, July 19, 2024.

৪. "হাসিনার পতন ও পলায়ন! বিশৃঙ্খল বাংলাদেশ এখন সেনা তত্ত্বাবধানে, দু'দফার গণরোষ ও 'অগস্ট বিপ্লব'," *আনন্দবাজার*, আগস্ট ৫, ২০২৪

৫. 'আগেও ৪ বার নিষিদ্ধ হয়েছিল জামায়াত, তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখাবে না দলটি', *ঢাকাপ্রকাশ*, ২ আগস্ট, ২০২৪

৬. 'Factbox: Bangladesh's History of Upheaval and Coups.' *The Print*, August 5, 2024.

৭. Vir Sanghvi, 'Bangladesh is now India's potential enemy, Pakistan a declared enemy, China an open enemy', *The Print,* August 8, 2024

৮. '৪৯ বছর আগে ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়িতেই নিহত হন মুজিব, হাসিনাবিরোধী আগুনে পুড়ে ছাই সব স্মৃতি', *আনন্দবাজার*, আগস্ট ৫, ২০২৪

৯. Dey, Sreyashi. 'Jamaat May Take Control in Bangladesh, Expect an Influx of Hindus–BJP Leaders After Hasina Resigns.' *The Print*, August 5, 2024.

১০. দেবাশীষ দেবু, 'সিলেটে আক্রান্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবাই আওয়ামী লীগ নেতা', *দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, ১০ আগস্ট, ২০২৪

১১. *Mirror Now*. 'Bangladesh News | Attack On Hindus In Bangladesh? Mass Murders, Killings By Mob | Sheikh Hasina News.' *YouTube*, August 5, 2024.

১২. Ghaedi, Monir. 'Fact Check: False Claims Fuel Ethnic Tensions in Bangladesh.' *DW*, August 7, 2024.

১৩. 'Hindus Slaughtered in Bangladesh; Over One Crore Refugees May Enter West Bengal: Suvendu Adhikari', *Times of India*, August 6, 2024.

১৪. https://stophindugenocide.org/

১৫. 'On escape bid to Tripura, minor Bangladesh Hindu girl 'shot dead by BGB', *Times of India*, Sep 4, 2024.

১৬. 'What is Jamaat-e-Islami? 'Pakistan-backed' political party that brought down Sheikh Hasina govt in Bangladesh', *Times of India*, Aug 6, 2024

১৭. 'Bangladesh Protests: Are Pakistan's ISI and China behind protests in Bangladesh to nurture anti-India terror group?', *The Economic Times*, Aug 6, 2024

১৮. Dey, Sreyashi. 'Jamaat May Take Control in Bangladesh, Expect an Influx of Hindus–BJP Leaders After Hasina Resigns.' *The Print*, August 5, 2024.

১৯. Prashad, Vijay. 'Will Bangladesh Be Another Egypt?', *People's Dispatch*, August 24, 2024.

২০. গোলাম মর্তুজা অন্তু, ৯ বছরে হিন্দুদের উপর '৩৬৭৯ হামলা', *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, ১৮ অক্টোবর, ২০২১

২১. ঐ

২২. আলী রীয়াজ, *নিখোঁজ গণতন্ত্র: কর্তৃত্ববাদের পথরেখা ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ*, প্রথমা, ২০২২; Riaz, Ali. *Pathways of Autocratization: The Tumultuous Journey of Bangladeshi Politics*. 2024. Routledge.

২৩. 'India Pressed U.S. to Go Easy on Bangladeshi Leader Before Her Ouster, Officials Say.' *The Washington Post*, August 15, 2024.

২৪. Parvez, Saimum. 'India's Role in Bangladesh Elections Sparks Outrage.' *East Asia Forum*, June 4, 2024.

২৫. Hussain, Ahmede. 'Mobs Are Still Calling the Shots in Bangladesh. Yunus Government Appears Weak to Act.', *The Print*, September 7, 2024.

২৬. 'Islamic radicals want to make Bangladesh another Afghanistan, it's scary and alarming: Taslima Nasrin,' *The Hindu*, September 5, 2024.

২৭. Dipanjan Roy Chaudhury, 'Outlawed Radical outfit Hizbut Tahrir pressurizes Bangladesh interim government to lift ban', *The Economic Times*, September 11, 2024. 'কাদের মঞ্চে তুলেছিলেন ইউনূস', *আনন্দবাজার*, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪

২৮. Azad Essa, *Hostile Homelands: The New Alliance Between India & Israel*, Pluto Press, 2023

[প্রবন্ধটি তৈরি করার ক্ষেত্রে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন বন্ধু সহুল আহমদ ও তানভীর আকন্দ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক খোরশেদ আলম। সংস্কৃতি তাত্ত্বিক মোহাম্মদ আজম প্রবন্ধটি লিখতে ক্রমাগত তাগিদ জানিয়েছেন। তাঁদের সবার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। প্রবন্ধটির খসড়ারূপ 'জুলাই গণপরিসর' আয়োজিত একটি সেমিনারে প্রথম উপস্থাপন করা হয়। ১১/১০/২৪, স্থান: সিরাজুল ইসলাম লেকচার হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

এ কে এম জাকারিয়া

জুলাই-আগস্ট হত্যাযজ্ঞ ও সাংবাদিকদের দায়

জুলাই-আগস্টের হত্যাযজ্ঞ ও বর্বরতার অনেক ভিডিয়ো বিভিন্ন সংবাদ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমরা দেখেছি। অনেক ভিডিয়োতে এমন নিষ্ঠুরতার দৃশ্য আছে যে তা সহ্য করা যায় না। এসব ভিডিয়ো দেখার সময় অনেককেই চোখ ঢাকতে দেখেছি, কাঁদতে দেখেছি। পুলিশের পাশাপাশি দলের গুন্ডারাও শামিল ছিল এসব অপকর্মে। গণ-অভ্যুত্থানের সময় পুলিশের বর্বরতার একটি প্রামাণ্যচিত্র সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ট্রুথ অ্যান্ড জাস্টিস নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগে ছবিটি তৈরি হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমেও ছবিটি দেখানো হচ্ছে।

শেখ হাসিনার পালিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে আগে যাত্রাবাড়ী থানার সামনে ঘণ্টা দেড়েক সময়ের মধ্যে কী ঘটেছিল, তার প্রামাণ্যদলিল এ ছবি। বলা হচ্ছে, বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করা ফুটেজগুলো দীর্ঘ সময় বিচার-বিশ্লেষণের পর ছবিটি তৈরি করেছে তারা। ছবিতে দেখা গেছে কীভাবে ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচার গুলি চালিয়েছে পুলিশ।

দেশের অনেক জায়গায়ই এমন ঘটনা ঘটেছে। সেসব ঘটনার ভিডিয়ো সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাইয়ের কাজ অনেকেই করছেন নিশ্চয়ই। জুলাই-আগস্ট হত্যাযজ্ঞ নিয়ে নতুন নতুন আরও প্রামাণ্যচিত্র সামনে আমরা দেখতে পাব আশা করি। জুলাই-আগস্ট গণহত্যার বিচারের জন্যও তথ্যপ্রমাণ হিসাবে ভিডিয়ো ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম 'অসংখ্য ডিজিটাল এভিডেন্স' সংগ্রহ করার কথা নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও জানেন, আওয়ামী লীগ সরকার এবং তাঁদের দলীয় ক্যাডারে পরিণত হওয়া কিছু পুলিশ কর্মকর্তার নির্দেশে তাঁরা কত বড়ো অন্যায় ও অপকর্ম করেছেন। যে কারণে দেশের সব থানা থেকে পুলিশবাহিনীর লোকজন পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। পুলিশ ও র‍্যাবপ্রধান সম্প্রতি গণ-অভ্যুত্থানে তাঁদের ভূমিকার জন্য দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

তবে জুলাই-আগস্ট গণহত্যার মূল দায় যাঁদের, সেই আওয়ামী লীগ বা তাঁদের নেতৃত্বের কোনো বোধোদয় হয়েছে বলে মনে হয় না। পতিত আওয়ামী

লেখক: উপসম্পাদক
প্রথম আলো

বনানী-মিরপুর ফ্লাইওভার, ঢাকা
০৫ আগস্ট ২০২৪

লীগ সরকার, দলের লোকজন এবং তাদের লুটপাটের সহযোগী বিভিন্ন পেশার অনেকে আটক হয়েছেন। আবার অনেকে দেশে-বিদেশে পালিয়ে আছেন। বিশেষ করে যাঁরা বিদেশে আছেন, তাঁদের কেউ কেউ এখন বিভিন্ন মাধ্যমে কথা বলতে শুরু করেছেন। তাঁদের কাছ থেকে শত শত মানুষ খুনের জন্য ক্ষমা চাওয়া তো দূরের কথা, কোনো অনুশোচনার কথাও শোনা যাচ্ছে না। মানুষ খুনের এসব ভিডিয়ো বা তথ্যপ্রমাণ তাঁদের মনে কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, কে জানে! তাঁদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা বা মনোবিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভুল, অপকর্ম বা অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চাওয়ার নজির নেই। জামায়াতে ইসলামী একাত্তরে তার ভূমিকার জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চায়নি। বোঝা যায়, আওয়ামী লীগও সেই একই পথ ধরেছে। তারা ক্ষমা চাইবে না, নিজেদের অপকর্মের পক্ষে সাফাই গেয়ে যাবে। জুলাই-আগস্ট গণহত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের উদ্যোগ চলছে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যাঁরা সরাসরি এ গণহত্যায় ভূমিকা রেখেছেন, তাঁরাই সম্ভবত বিচারের আওতায় আসবেন। তবে সেটা কতটুকু ও কোন মাত্রায় নিশ্চিত করা যাবে, তা ভবিষ্যৎই বলবে।

২.

সাংবাদিকতা করি বলে অনেকেই জানতে চান, দেশে ফ্যাসিবাদ গেড়ে বসার পেছনে তো সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের বড়ো ভূমিকা রয়েছে। তাঁরা প্রশ্ন করেন, এই যে গণহত্যা হলো, এর কোনো দায় কি সাংবাদিকদের নেই?

এটা স্বীকার করতে কোনো সমস্যা নেই যে গত ১৬ বছর দেশে যে শাসন কায়েম হয়েছিল, তার শিকড় গাড়তে ও ডালপালা ছড়াতে সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের একটি বড়ো অংশ খুবই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। তাঁরা এই শাসনের পক্ষে সম্মতি তৈরির কাজ করে গেছেন কোনো রাখঢাক ছাড়াই। এসব করার বিনিময়ে তাঁরা সরকারের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন, ব্যাবসা বাগিয়েছেন, তদবির-বাণিজ্য করে পয়সা কামিয়েছেন। এভাবে একপর্যায়ে তাঁরা ক্ষমতাকাঠামোর অংশে পরিণত হয়েছেন। ক্ষমতা রক্ষার দায় থেকে তখন তাঁরা, এমনকি যাঁরা পেশাদার ও সাহসী সাংবাদিকতা করার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের গলা চেপে ধরতেও কসুর করেননি।

গণহত্যা যখন চলছিল, তখনো এই সাংবাদিকদের সেই ভূমিকায় দেখা গেছে। পুলিশ যখন মারমুখী, পুলিশ যখন নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে, তখনো তাঁরা পুরো সমর্থন নিয়ে ক্ষমতাকেন্দ্রে হাজির থেকেছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিই: আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন ১৬ জুলাই আর ২৪ জুলাই শেখ হাসিনার সঙ্গে মতবিনিময় করতে এসেছিলেন দেশের 'শীর্ষস্থানীয়' সাংবাদিকরা। তাঁরা দেশজুড়ে 'নাশকতা ও নৃশংসতার' ঘটনায় কোনো অপরাধীকে ছাড় না দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। সেই সাংবাদিকরা সেদিন আরও নিশ্চিত করেছিলেন, তাঁরা শেখ হাসিনার সঙ্গে আছেন এবং তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত।

গণহত্যা চালিয়ে যাওয়ার 'মনোবল' ধরে রাখতে তাঁরা কি শেখ হাসিনাকে সহায়তা করেননি? তাঁরা দায় এড়াবেন কীভাবে?

৩.

রুয়ান্ডার গণহত্যার কথা আমাদের অনেকেরই জানা। ১৯৯৪ সালের ৭ এপ্রিল শুরু হওয়া এ গণহত্যায় সংখ্যাগুরু হুতিদের হাতে ১০০ দিনে প্রায় ১০ লাখ লোক প্রাণ হারায়। তাদের অধিকাংশই সংখ্যালঘু তুতসি সম্প্রদায়ের। এই সহিংসতা উসকে দেওয়া এবং দীর্ঘায়িত

করার পেছনে গণমাধ্যমের বিশেষ দায় রয়েছে। গণহত্যা ঘটানোর আগে হুতি চরমপন্থিদের নানা উদ্যোগের মধ্যে একটি ছিল রেডিয়ো স্টেশন স্থাপন করা। আরটিএলএম নামের রেডিয়ো স্টেশনটি তুতসিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো এবং সহিংসতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এই রেডিয়োর সহযোগী হিসাবে কাজ করেছে কাঙ্গুরা নামের একটি সংবাদপত্র।

রুয়ান্ডার গণহত্যায় গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে অনেক গবেষণা ও বিশ্লেষণ হয়েছে। দেখা গেছে, হুতি চরমপন্থিদের পরিচালিত রেডিয়োটি তুতসিদের হত্যা করতে উৎসাহিত করেছে এবং হত্যাকাণ্ডের ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করে গেছে। আত্মরক্ষার অংশ হিসাবে তুতসিদের হত্যা করা জরুরি–এমন একটি প্রচারণা তারা চালিয়ে গেছে। গবেষক, যুদ্ধ-সাংবাদিক ও কূটনীতিক সামান্থা পাওয়ারের মন্তব্য, তুতসিদের হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের অনেকের এক হাতে ছিল দা এবং অন্য হাতে রেডিয়ো।

আরেক বিশ্লেষক মেল ম্যাকনাল্টি রেডিয়োটিকে (আরটিএলএম) গণহত্যার সহযোগী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন, রেডিয়োর প্রচারণা এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করেছে, যাতে হুতিরা মনে করেছে, তুতসিদের হত্যা করা তাদের টিকে থাকার জন্য জরুরি। বৈশ্বিক মানবাধিকার সংগঠন 'আর্টিকেল ১৯'-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, আরটিএলএম ছিল গণহত্যা বাস্তবায়নের একটি সুস্পষ্ট হাতিয়ার।

২০০৩ সালে রুয়ান্ডার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আরটিএলএম রেডিয়োর সহপ্রতিষ্ঠাতা ফার্দিনান্দ নাহিমানা, নির্বাহী পরিচালক জ্যঁ-বসকো বারায়গওয়িজা এবং কাঙ্গুরা পত্রিকার সম্পাদক হাসান এনগেজেকে ঘৃণা উসকে দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেন। রেডিয়ো সম্প্রচার ও সংবাদপত্রের ঘৃণা ছড়ানোর ঘটনাগুলোকে ট্রাইব্যুনাল মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

রুয়ান্ডার অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের কিছু শিক্ষা নেওয়ার আছে কি?

৪.

গত ১৬ বছরে বাংলাদেশে অনেক সংবাদমাধ্যমের জন্ম হয়েছে পতিত সরকারের সমর্থনে ও আশ্রয়-প্রশ্রয়ে। অনেকের সাংবাদিকতার শুরুই এই 'পোষা' সাংবাদিকতার অপচর্চার মধ্য দিয়ে। আবার এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে অনেকেই সৎ ও সাহসী সাংবাদিকতা জারি রাখার চেষ্টা করে গেছেন। একটি রক্তঝরা গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে। অন্য সবকিছুর মতো গণমাধ্যম নিয়েও তৈরি হয়েছে প্রত্যাশা। কিন্তু গত ১৬ বছরের পোষা সাংবাদিকতার অভ্যাস বা চর্চা থেকে কি দেশের সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বের হয়ে আসতে পারবে?

এখানে পরিবর্তন চাইলে ১৬ বছর ধরে সংবাদমাধ্যমকে খাঁচায় পুরে ফেলতে কী কী কৌশল নেওয়া হয়েছিল, সাংবাদিকদের কীভাবে পোষা সাংবাদিকে পরিণত করা হয়েছিল, সেগুলো চিহ্নিত করা দরকার।

রুয়ান্ডার অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে জুলাই-আগস্ট গণহত্যায় সাংবাদিকদের দায়ের বিষয়টিরও একটি নিষ্পত্তি দরকার। গণমাধ্যম সংস্কারের পথ এভাবেই তৈরি হতে পারে।

গত ১৬ বছরে বাংলাদেশে অনেক সংবাদমাধ্যমের জন্ম হয়েছে পতিত সরকারের সমর্থনে ও আশ্রয়-প্রশ্রয়ে। অনেকের সাংবাদিকতার শুরুই এই 'পোষা' সাংবাদিকতার অপচর্চার মধ্য দিয়ে। আবার এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে অনেকেই সৎ ও সাহসী সাংবাদিকতা জারি রাখার চেষ্টা করে গেছেন। একটি রক্তঝরা গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে। অন্য সবকিছুর মতো গণমাধ্যম নিয়েও তৈরি হয়েছে প্রত্যাশা

সহুল আহমদ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান
সহিংসতাবিষয়ক বয়ানের রকমফের

জুলাইয়ের মধ্যেভাগে কোটা সংস্কারের আন্দোলন যে পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল, তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পতনের মধ্য দিয়ে। বিগত দেড় দশকের আওয়ামী রেজিমকে ফ্যাসিবাদী, উর্দিবিহীন স্বৈরতন্ত্র, নিখোঁজ গণতন্ত্র, কর্তৃত্ববাদী ইত্যাদি নানা বর্গে চিহ্নিত করলেও এর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রায় সব বর্গতেই হাজির ছিল। টানা তিন মেয়াদে কারচুপির নির্বাচন, পদ্ধতিগত গুম, খুন, ক্রসফায়ার (বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড), মতপ্রকাশে দমনপীড়ন ও অর্থ পাচার ছিল গণতন্ত্রহীন হালতে উপনীত হওয়ার নির্ধারক। ফলে চাকরিজনিত ইস্যুর অসিলায় মূল আন্দোলন মাঠে গড়ালেও সরকারি দমনপীড়ন এবং এক দশকের বেশি সময় অগণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার অধীনে বসবাসের যন্ত্রণা পুরো জনগোষ্ঠীকে বিদ্যমান রাষ্ট্র ও ক্ষমতাকাঠামোয় পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রবল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত করে।

যদিও মনে হতে পারে, এটা দ্রুততার সঙ্গে ঘটেছে; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে–যে রেজিম যত দীর্ঘমেয়াদি, তার পতনও তত দ্রুত হয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাস যেমন আমাদের কাছে আচানক হয়, তেমনই রাজনৈতিক স্থবিরতা কাটাতে শিক্ষার্থীদের তৎপরতাও আচানক ছিল না। আইয়ুব খানের আমলে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন তৎকালীন রাজনৈতিক স্থবিরতাকে কাটিয়ে দিয়েছিল[১]; এরশাদের আমলে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন রাজনৈতিক দলগুলোকে দিশা দিয়েছিল।[২] তবে আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয় সহিংসতার হিসাব আমলে নিয়ে বলা যায়, কেবল মুক্তিযুদ্ধকালের যুদ্ধাবস্থা ব্যতীত আর কোনো আন্দোলনে এত রক্ত ঝরেনি। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ৬১ জনের মতো লোক প্রাণ হারিয়েছিলেন। এবার আন্দোলনের প্রায় ১৪০০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। যে আইয়ুব শাসনামলকে পুরো জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা চরম নেতিবাচক ও ন্যক্কারজনক হিসাবে উপস্থাপন করে এসেছে, সেই আইয়ুবের পুলিশ-সেনাবাহিনী চূড়ান্ত অবস্থায়ও এত লোককে হত্যা করতে পারেনি। কিন্তু বাংলাদেশে হরদম মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাম জপনেওয়ালা দল নির্বিচারে এই হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে।

লেখক: গবেষণা বিশেষজ্ঞ, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

রাজধানীর কারওয়ান বাজার এলাকার কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ থেকে তোলা; ছবি: মো. আহছান উল্লাহ; ৪ আগস্ট ২০২৪ সূত্র: প্রথম আলো

এই প্রবন্ধে প্রধানত অভ্যুত্থানের সহিংসতার দিকটি আলোচনা করা হবে। প্রথমত, আন্দোলন কি সহিংস ছিল, নাকি অহিংস ছিল? নাগরিক আন্দোলনের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এবং আন্দোলনের নানাবিধ বর্গের কোথায় জুলাই অভ্যুত্থানকে স্থান দেওয়া যেতে পারে? দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও এর রাষ্ট্রীয় বয়ানের ধরন কেমন ছিল? তৃতীয়ত, অভ্যুত্থান-পরবর্তী সহিংসতা ও মব লিঞ্চিং/ভায়োলেন্সকে কীভাবে আলোচনা করা যেতে পারে?

অহিংস ও সহিংসতার *ডাইকোটমি* ছাড়িয়ে?

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান যে দুটো আন্দোলনের সরাসরি উত্তরাধিকারী–২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন ও নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন–এর ধরন অন্তত কেতাবি ভাষায় বলতে হয়, অহিংস ছিল। এমনকি ১০ বছর ধরে বিএনপি যত আন্দোলন করেছে, সেখানে রাষ্ট্রীয় নানাবিধ উসকানি থাকা সত্ত্বেও সহিংসতা থেকে নিজেদের দূরে রাখার যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা, তাতে কৌশল হিসাবে অহিংস নাগরিক অনানুগত্য বা সিভিল ডিসঅভিডিয়েন্সকেই কৌশল হিসাবে গ্রহণের নজির ধরা পড়ে। এখন জুলাই মাসেও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন যখন মাঠে গড়ায়, তখনও সেটার পন্থা–যেমন: রোড ব্লক, সমাবেশ, মিছিল প্রভৃতি মোটা দাগে অহিংসের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু একটা সময় পর যখন, প্রধানত রাষ্ট্রীয় সহিংসতা প্রতিরোধে/বিরুদ্ধে আন্দোলনে 'জ্বালাও-পোড়াও' হাজির হলো, তাতে এই প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে আমাদের জন্য–তাহলে আন্দোলনের ধরন কেমন? অহিংস নাকি সহিংস? আর এ সহিংস বা অহিংস আন্দোলন বলতে আদতে দুনিয়াতে কী বুঝিয়ে থাকে?

দীর্ঘদিন ধরে সহিংসতাকে (ভায়োলেন্স) অভ্যুত্থান ও বিপ্লবের সর্বাধিক জরুরি অনুষঙ্গ বলেই বিবেচিত হয়েছে। উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনগুলো কেন অনিবার্যরূপে সহিংসতাতেই পর্যবসিত হয় বা শ্রেণিসংগ্রাম কেন সহিংস হয়ে উঠতে বাধ্য হয়, তা নিয়ে প্রচুর তত্ত্বকথা তৈরি হয়ে আছে। খোলা চোখে দেখলে ধ্রুপদি যে বিপ্লবগুলোর কথা আমরা স্মরণ বা কল্পনা করি, এর সবই ছিল সশস্ত্র লড়াই। আন্দোলন/বিপ্লব/অভ্যুত্থান হবে এবং সেটা সহিংসতা কায়দা ছাড়া সাফল্য আদায় করা সম্ভব হবে না–এমনতর ভাবনার প্রাধান্য ছিল প্রায় সবখানেই। আমাদের মতো দেশে, যেখানে দীর্ঘদিনের সশস্ত্র বামপন্থি রাজনীতির ঐতিহ্য রয়েছে, সেখানে তো এই ভাবনার বাইরে আসলে খুব একটা আলোচনাই নেই, যদিওবা আমাদের ইতিহাসের চর্চিত অধিকাংশ আন্দোলনের ধরন ছিল 'অহিংস'।[৩]

ইতিহাসে অহিংস আন্দোলনের নজির দীর্ঘ হলেও খুব বেশি দিন হয়নি বিদ্যায়তনিক জগতে এ নিয়ে আলোচনা শুরুর। উনিশ শতকে হেনরি ডেভিড থরো[৪] বা বিশ শতকের হাওয়ার্ড জিন[৫] নৈতিক জায়গা থেকে সিভিল ডিসঅভিডিয়েন্স বা গণ-অনানুগত্যের কথা বলেছেন, অন্যদিকে জিন শার্প[৬] কৌশলের জায়গা থেকে দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের অহিংস আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। হালজমানার গবেষকরা খেয়াল করেছেন যে, পৃথিবীতে অহিংস প্রতিরোধ দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরিখা চেনোওয়েথ ও স্টিফেন তাঁদের এক গবেষণায় প্রায় একশ সহিংস ও অহিংস আন্দোলনের হিসাব কষে দেখালেন যে, ৫২ শতাংশ অহিংস আন্দোলন সফলতার মুখ দেখেছে, অন্যদিকে সহিংস আন্দোলনের ক্ষেত্রে সে হার মাত্র ২৬ শতাংশ।[৭] এখন এখানে সহিংস আন্দোলন বলতে বোঝানো হচ্ছে, যেখানে আন্দোলনের নীতি ও কৌশল হিসাবে ভায়োলেন্সকে গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে অহিংস হচ্ছে–যেখানে আন্দোলনের নীতি ও কৌশল হচ্ছে প্রাণহানি রোধ বা হ্রাস করা। ফলে এখানে সহিংসতাকে পরিহার করে নিরস্ত্র বিভিন্ন কায়দাকানুন, যেমন: সমাবেশ, হরতাল, ধর্মঘট, বয়কট, অসহযোগিতা প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। যারা অহিংস আন্দোলনের পক্ষে ওকালতি করেন, তারা এও দেখিয়েছেন বা বলেনও যে, প্রাতিষ্ঠানিক ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে অহিংস আন্দোলনের প্রভাব সহিংস আন্দোলনের চেয়ে বেশি।[৮]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে–কোনো আন্দোলনকে কি পুরোপুরি অহিংস বা সহিংস ডাইকোটমিতে ভাগ করে ফেলা সম্ভব? অহিংস আন্দোলনের মধ্যে কি সহিংসতা থাকতে পারে না? যেমন: বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যা দেখা গেল গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, নেতৃস্থানীয়দের বাসাবাড়ি ও পুলিশের থানা লুট ও অগ্নিসংযোগ, এগুলোকে সহিংস নাকি অহিংস হিসাবে চিহ্নিত করা হবে? কেউ কেউ এটাকেও সহিংসতা বলতে চাচ্ছেন;

আবার কেউ কেউ এই নজিরগুলোকে 'সহিংস' বললেও আন্দোলনের কৌশল হিসাবে যেহেতু এসব মানুষের জানের ওপর হামলা করেনি বা একে মূল কৌশল হিসাবে চিহ্নিত করেনি, সেহেতু এর ফলে আন্দোলনকে সহিংস বলতে নারাজ। 'অহিংস' ও 'সহিংস' এই বর্গের শিথিলতার কারণে সাম্প্রতিক গবেষকরা একটু ভিন্নভাবে আন্দোলনগুলোকে বর্গায়িত করেন: নিরস্ত্র প্রতিরোধ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ।[৯] এখানে 'সশস্ত্র প্রতিরোধ' বলতে কী বোঝাচ্ছে, তা সহজেই অনুমেয়; সহিংস আন্দোলনের সংজ্ঞায় যা বলা হয়েছিল, সেটাই ছিল সশস্ত্র প্রতিরোধ। অন্যদিকে 'নিরস্ত্র প্রতিরোধ'-এর মধ্যে পড়ে অহিংস প্রতিরোধ এবং নিরস্ত্র সামূহিক সহিংসতা (আন-আর্মড কালেক্টিভ ভায়োলেন্স)। অহিংস প্রতিরোধ হচ্ছে সমাবেশ, হরতাল, বয়কট প্রভৃতি, যেখানে প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোই মূল উদ্দেশ্য।

অহিংস আন্দোলনের এমন 'সহিংস' উপাদানের প্রভাব কেমন হতে পারে, এ নিয়েও দুটি মত রয়েছে। একপক্ষ মনে করে, এটা দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলনে ক্ষতি করে, কেননা তা রাষ্ট্রীয় নিপীড়নকে জায়েজ করে তুলতে পারে। অন্যদিকে আরেক পক্ষ মনে করে, এ ধরনের আন-আর্মড কালেক্টিভ ভায়োলেন্স দিনশেষে ফলদায়ক। ২০১১ সালের মিশরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কেউ কেউ দেখিয়েছেন, এ ধরনের সহিংসতা, যেমন: পুলিশের থানা লুট বা অগ্নিসংযোগ আন্দোলনকে বেগবান করেছিল। এক হিসাবমতে, ২০১১ সালে মিশরে আরববসন্তকালে প্রায় ৪ হাজার পুলিশের যানবাহন এবং ২৫ শতাংশ থানায় ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছিল। কায়রোতেই প্রায় ৫০ শতাংশ থানা লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয়েছিল। তারা বলছেন, এ ধরনের সহিংসতা দিনশেষে রাষ্ট্রীয়

> ২০০৬-২০২০ সালের মধ্যে পৃথিবীতে যত আন্দোলন দেখা যায়, এর অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রধান কারণ ছিল। পাশাপাশি আন্দোলনের পদ্ধতি পুরোদমে অহিংস হলেও প্রায় ২০ শতাংশ ক্ষেত্রে ভ্যান্ডালিজম ও লুটপাট দেখা যায়। ফলে শুধু বাংলাদেশেই নয়, এটা সারা দুনিয়ার গণ-আন্দোলনের খুব সাধারণ উপাদান

অন্যদিকে *নিরস্ত্র সামূহিক সহিংসতা* হচ্ছে নিরস্ত্র জনতার সামূহিক অ্যাকশন, সেখানে ভাঙচুর (ভ্যান্ডালিজম), সম্পত্তির ধ্বংস করা, রাস্তায় ইটপাটকেল ছোড়া, অগ্নিসংযোগ করা প্রভৃতি থাকবে; কিন্তু সামরিক অস্ত্র বলতে যা বোঝায়, এর ব্যবহার থাকবে না। জনগণ অনেকটা খালি হাতে যে লড়াই চালায়, সেটাকেই এখানে 'নিরস্ত্র সামূহিক সহিংসতা' হিসাবে বোঝানো হচ্ছে। ফলে 'সহিংস' ও 'অহিংস'–আন্দোলনের এ দুই বর্গকে প্রতিস্থাপন করা হয় 'সশস্ত্র' ও 'নিরস্ত্র' এ দুই বর্গ দিয়ে। অহিংস আন্দোলনকে নিরস্ত্র আন্দোলনের অংশবিশেষ হিসাবে যেমন চিহ্নিত করা হয়, তেমনই নিরস্ত্র প্রতিরোধকে কখনো কখনো অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে সমার্থক হিসাবেই তুলে ধরা হয়।

এ আলোচনায় আরেকটি প্রশ্ন অবধারিতভাবে চলে আসে–একেবারে অহিংস আন্দোলনে কখন সহিংস উপাদান যুক্ত হয়? অহিংস প্রতিরোধ কখন নিরস্ত্র সামূহিক সহিংসতার দিকে ধাবিত হয়? গবেষকরা মনে করেন, আন্দোলন অহিংস থেকে সহিংসতার দিকে যাত্রা করে প্রধানত রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে। ইতিহাসে সহিংস আন্দোলন থেকে অহিংস আন্দোলনের রূপান্তরের নজির যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে অহিংস আন্দোলনের সহিংস হয়ে ওঠার নজির। সেটা সশস্ত্র না হলেও আমরা ওপরে যা নিরস্ত্র সামূহিক সহিংসতা হিসাবে চিহ্নিত করেছি, সেদিকে ধাবিত হয়। রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের নির্মমতা যেমন অহিংস আন্দোলনকে সহিংস করে তুলে বা সহিংস উপাদান যুক্ত করতে বাধ্য করে, তেমনিই আন্দোলনে সমাজের কত বিচিত্র শ্রেণি ও রাজনৈতিক শ্রেণি যুক্ত হয়েছে, এর ওপর নির্ভর করে সেই মাত্রাটা। আন্দোলন যত স্বতঃস্ফূর্ত হয়, তাতে নিরস্ত্র সামূহিক সহিংসতার দিকে ধাবিত হওয়ার ঝুঁকিও বেশি থাকে। আগেই উল্লেখ করেছি, এই 'সহিংসতা'র মাত্রা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে বিস্তর মতবিরোধ রয়েছে। লুটপাট বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতিকে কেউ কেউ 'সহিংস' উপাদান বললেও অনেকেই এটাকে 'অহিংস' বলেই রায় দেন। এরিখা মনে করেন, এটা আন্দোলনের কৌশলের ওপর নির্ভর করে।

নিপীড়ন কমাতে সাহায্য করেছিল। ফলে এটা অহিংস আন্দোলনের বিপরীতে না গিয়ে এটাকে আরও বেগবান করেছিল। পাশাপাশি আরেক দল গবেষক দেখিয়েছেন, স্ট্রিট ফাইটিং বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির মতো লো-লেভেলের ভায়োলেন্স রাজনৈতিক মুক্তির (পলিটিক্যাল লিবারেলাইজেশন) সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এমনকি এ ধরনের লড়াই বা সহিংসতা অ্যাক্টিভিস্ট বা রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে আবেগ সঞ্চার করে, একধরনের রাজনৈতিক এম্পাওয়ারমেন্টের অনুভূতি প্রদান করে।[১০]

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে দেখলে আমরা এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পুরোদমে অহিংস আন্দোলন ছিল। শেখ হাসিনা কর্তৃক আন্দোলনকারীদের রাজাকার বলে গালি দেওয়ার পর আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। আওয়ামী লীগের মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের যখন ছাত্রলীগকে আন্দোলন দমানোর খোলা আহ্বান জানালেন, তখনই প্রথম আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালানো হলো। এরপর সেই হামলায় যুক্ত হয়েছে পুলিশ ও বিজিবি। পুলিশের গুলিতে একদিকে যেমন রাজপথ রক্তাক্ত হচ্ছিল, তেমনই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছাত্র-জনতা প্রতিরোধও গড়ে তুলেছিলেন। পুলিশি নিপীড়ন, ক্রসফায়ার, গুম, অবিচার, দুর্নীতি, লুট, পাচার, বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিসহ আওয়ামী লীগ জমানার নানাবিধ অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে জমে থাকা দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ছিল এই প্রতিরোধ।[১১] পুলিশের আক্রমণের তীব্রতার সঙ্গে জনতার প্রতিরোধও শক্ত হচ্ছিল। সারাদেশের বিভিন্ন স্থান ও স্থাপনায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। আওয়ামী লীগ যেসব স্থান, নিদর্শন বা প্রতীক ব্যবহার করে দিনের পর দিন দুর্নীতিকে জায়েজ করেছে, গণতান্ত্রিক যাত্রাকে রুদ্ধ করে কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠতে ইস্তামাল করেছে, সেগুলোর প্রতি জনতার আক্রোশ পড়েছে সর্বাধিক। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় যেমন আগুন দেওয়া হয়েছে, তেমনই আন্দোলনের মুহূর্তে বিভিন্ন থানায় আগুন দেওয়া হয়েছে। রাজপথে খালি হাতে পুলিশের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছে সাধারণ জনগণ।

যাত্রাবাড়ী, ১৮ জুলাই ২০২৪, স্টার

অর্থাৎ, রাষ্ট্রীয় সহিংসতার মুখোমুখি হয়ে আন্দোলনে সহিংস উপাদান যুক্ত হয়েছে, যাকে আমরা বলছি নিরস্ত্র সামূহিক সহিংসতা। এতে রয়েছে রাজপথ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় অগ্নিসংযোগ, পুলিশের দিকে ইটপাটকেল ছোড়া, পুলিশকে ধাওয়া দেওয়া, থানায় হামলা করা এবং আন্দোলনের শেষের দিকে ক্ষমতাসীনদের প্রতিষ্ঠান ও বসতবাড়িতে লুট ও অগ্নিসংযোগ। এ ধরনের সহিংসতা আমাদের মিডিয়া বা গণপরিসর আচানক হিসাবে ঠাহর করলেও জুলাইয়ের পত্রিকায় ধ্বংসযজ্ঞের অজস্র বিবরণ বিবেচনা নিয়ে সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলনের ইতিহাস মোটেও আচানক কিছু নয়। ২০০৬-২০২০ সালের মধ্যে পৃথিবীতে যত আন্দোলন দেখা যায়, এর অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রধান কারণ ছিল। পাশাপাশি আন্দোলনের পদ্ধতি পুরোদমে অহিংস হলেও প্রায় ২০ শতাংশ ক্ষেত্রে ভ্যান্ডালিজম ও লুটপাট দেখা যায়।[১২] ফলে শুধু বাংলাদেশেই নয়, এটা সারা দুনিয়ার গণ-আন্দোলনের খুব সাধারণ উপাদান। প্রশ্ন করা উচিত ছিল–কেন অহিংস আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় সহিংসতা দেখা দিল?

রাজপথে 'জ্বালাও-পোড়াও' ও রাজনীতির নির্মাণ

বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আগুন কারা দিয়েছে, তা নিয়ে প্রচুর আলাপ-আলোচনা জুলাইজুড়ে রাজনৈতিক মহলে ঘুরপাক খেয়েছে। কিছু কিছু স্থানে আগুন দেওয়ার সঙ্গে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাই জড়িত বলে সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছিল।[১৩] অন্যদিকে ত্বরিতগতিতে যেভাবে কিছু কিছু স্থাপনার ভাঙচুরকে সিনেম্যাটিক স্টাইলে (কল্পনা করুন ভাঙা গ্লাসের সামনে বসে শেখ হাসিনার বক্তব্য) প্রোপাগান্ডার হাতিয়ার বানানো হয়েছে, তাতে খোদ আওয়ামী লীগের দিকেই ভাঙচুরের আঙুল তোলার অবকাশ ছিল বলে অনেকেই মনে করেন। আবার কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন, কেন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হলো না?[১৪]

এসবকিছুর গুরুত্বকে আমলে নিয়েই আমি বরং যে বিষয়টি নিয়ে অস্বস্তি প্রকাশ করছি সেটা হচ্ছে, অভ্যুত্থানকালীন সহিংসতা ও জ্বালাও-পোড়াওবিষয়ক বয়ান। সরকারি মহল থেকে শুরু করে বিদ্বৎসমাজ পর্যন্ত বলা শুরু করেছে, আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা; কিন্তু এ ধরনের জ্বালাও-পোড়াও-ভাঙচুর করছে শিক্ষার্থীদের কাঁধে সওয়ার হয়ে 'আন্দোলনের নামে' কিছু দুষ্কৃতকারী অথবা তৃতীয় পক্ষ (আওয়ামী বয়ান অনুযায়ী এই তৃতীয় পক্ষ হচ্ছে তাদের বিরোধী রাজনৈতিক দল, আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী)। সে ভাষ্য অনুযায়ী, শিক্ষার্থীরা 'কোমলমতি'। ফলে তারা এ ধরনের সহিংসতায় যোগ দিতে পারেন না এবং সরকার আসলে এসব দুষ্কৃতকারীকে দমন করেছে, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের কোনো বিরোধ নেই। এমনকি, খোদ মাহফুজ আনাম ২৬ জুলাই যে প্রবন্ধ লিখেছেন, সেখানে আন্দোলনের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছেন। সরকারকে প্রশ্ন করেছেন, আমরা কি আমাদের ভুল থেকে কিছুই শিখছি না? অথচ তিনি শুরুতেই বলেছেন:

> At the outset, we want to express our unambiguous condemnation of the mayhem created by ideologically and politically motivated groups whose aim was to destabilise our country, use the general discontent to instigate violence, and try to 'topple the government'—as claimed by some ministers and which, if true, we vigorously denounce. This has made us realise that our country faces internal enemies opposed to our development and overall success. The destruction of public property and the setting of fire to essential government offices, transport facilities and part of internet infrastructure that greatly crippled trade, manufacturing and the daily life of citizens need to be highly condemned, and the perpetrators exposed and punished within the law. We in the media will assist the government in unearthing this move against Bangladesh. Those who opposed our birth in 1971 must be resisted, defeated and destroed.[১৫]

ধ্বংসযজ্ঞ, অগ্নিসংযোগ নিয়ে সরকার যা বলছিল, এর সবচেয়ে পরিশীলিত রূপ পাওয়া যাচ্ছে মাহফুজ আনামের লেখায়। তিনি সরকারি বক্তব্য অনুসারে একাত্তর সালকেও এখানে নিয়ে এসেছেন এবং একাত্তরের বিরোধীদের প্রতিরোধ, পরাজিত ও ধ্বংস করে ফেলার প্রতিশ্রুতিও জানিয়েছেন।

কিন্তু এই অগ্নিসংযোগ, লুটপাট বা জ্বালাও-পোড়াও দেখে আঁতকে উঠলেও ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি, পাকিস্তান আমলে যত আন্দোলন ও অভ্যুত্থানের উল্লেখ মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবশালী ইতিহাসচর্চায় পাওয়া যায়, সেগুলোয়ও এ ধরনের 'জ্বালাও-পোড়াও' অত্যন্ত সাধারণ প্রবণতা ছিল। শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নেমেছেন, সরকার বাধা দিয়েছে। ফলস্বরূপ জ্বালাও-পোড়াও হয়েছে। আমাদের

ইতিহাসে এমন কোনো আন্দোলন পাওয়া যাবে না, যেখানে জ্বালাও-পোড়াও ধরনের ঘটনা ঘটেনি। যেমন: ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর নিয়ে সরকারি প্রেসনোটটা দেখেন:

> 'গতকল্য সকাল হইতেই ঢাকা শহরের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামা শুরু হয়। হাঙ্গামাকারী ও হুজুগ-প্রিয় তরুণদের সহিত মিলিত হইয়া ছাত্রগণ রাস্তায় চলাচলকারী প্রত্যেকটি গাড়ির গতিরোধ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে দুষ্কৃতিকারিগণ ছাত্রদের সহিত মিলিত হয় এবং হাঙ্গামা শুরু করে।'[১৬]

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান যে 'শান্তিপূর্ণ' ছিল না, তা তো প্রায় সব ইতিহাসবেত্তাই বিভিন্নভাবে আমাদের জানিয়েছেন। মওলানা ভাসানীকে নিয়ে সেসময় *টাইম* ম্যাগাজিন প্রতিবেদন ছাপিয়েছিল 'প্রফেট অব ভায়োলেন্স' নামে। সম্প্রতি মহিউদ্দিন আহমদ এক লেখায় জানাচ্ছেন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের কালে 'ঢাকায় তিন-চারজন মন্ত্রীর বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছিল, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান যে গেস্টহাউজে ছিলেন, সেখানে আগুন দেওয়া হয়েছিল, দৈনিক পাকিস্তান ও মর্নিং নিউজ-এর অফিসে আগুন দেওয়া হয়েছিল'।[১৭] হায়দার আকবর খানের বিবরণীটা পড়ে দেখুন: 'মার্চ মাসে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন গ্রামের দিকে ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকটি থানায় জনগণ আক্রমণ করে বন্দুক লুট করে। কিন্তু তেমন ঘটনা খুব বেশি নয়...গ্রামে গ্রামে তহশিল অফিসে জনগণ আগুন দেয়। কয়েকটা অঞ্চলে গরুচোরদের ধরে অথবা সাধারণভাবে খুব ঘৃণিত ব্যক্তিদের ধরে প্রকাশ্যে গণআদালত করে বিচার করে জবাই করা হয়েছিল'।[১৮] এই তাৎক্ষণিক বিচার নিয়ে তৎকালে *দ্য গার্ডিয়ান* লিখেছিল: "There are reports of setting up in parts of Pakistan of 'People's courts' which were meting out instant executions to score of wrong doers before mobs of widely applauding peasants."[১৯]

এমনকি শেখ হাসিনা ও তৎকালীন সরকারি বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে এ জ্বালাও-পোড়াওকেই 'হত্যাযজ্ঞ'-এর প্রিটেক্সট হিসাবে উল্লেখ করেছেন, এর সঙ্গে একাত্তর সালের ইয়াহিয়া খান-সহ পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের বক্তব্যের হুবহু মিল রয়েছে। ২৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণ থেকে শুরু করে পুরো নয় মাস পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের প্রিটেক্সট হিসাবে মার্চের অসহযোগ আন্দোলনে আওয়ামী লীগ-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 'ধ্বংসযজ্ঞ' ও 'আইন অমান্য'কে হাজির করেছিল। এমনকি নব্বই-এর গণ-আন্দোলন বা নব্বই-পরবর্তী সময়ে শেখ হাসিনার বিভিন্ন আন্দোলনে রাজপথের জ্বালাও-পোড়াও ছিল অতীব সাধারণ ঘটনা।

মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের আন্দোলনের ইতিহাসের আলোকে যদি আমি জুলাই অভ্যুত্থানকে বিবেচনায় নিই, তাহলে রাষ্ট্রীয় সহিংসতার প্রতিক্রিয়ায় এই 'জ্বালাও-পোড়াও' মোটেও কোনো নতুন ফেনোমেনোন নয়। আমাদের ইতিহাসে সেই ঔপনিবেশিক আমল থেকেই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাজপথে নামা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়ার বিপরীতে 'সহিংস' হয়ে ওঠা একেবারে 'রাজনীতি' নামক বিষয়টার সঙ্গেই জড়িত। আমি বলছি না যে, 'জ্বালাও-পোড়াও'-ই গণ-অভ্যুত্থান। বরং বলছি, জনগণের অসন্তোষ যখন গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দেয়, তখন সেখানে এ ধরনের সহিংস উপাদান থাকে। অন্তত ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দিচ্ছে। ভারতবর্ষে 'রাজনীতির নামে' এই ধরনের আইনভঙ্গের সহিংস ঘটনা নিয়ে দীপেশ চক্রবর্তী যেমন বলছিলেন, "The incidents are a large part of what takes place today not just in 'the name of politics' but rather as the very stuff of politics itself."[২০]

বাংলাদেশে বিদ্যমান ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থায় যেখানে ন্যূনতম নির্বাচনের মাধ্যমে রেজিম বদলের সব পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তখন 'নিয়মতান্ত্রিক' পথে আন্দোলন মানেই হচ্ছে রাষ্ট্রের বাতলে দেওয়া পথে আন্দোলন করা। আর যাই হোক, বিদ্যমান রাষ্ট্র ও ক্ষমতাকাঠামো পরিবর্তনের লড়াই রাষ্ট্রের বাতলে দেওয়া 'নিয়মতান্ত্রিক' পথে হওয়ার কথা ছিল না

বাংলাদেশে বিদ্যমান ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থায় যেখানে ন্যূনতম নির্বাচনের মাধ্যমে রেজিম বদলের সব পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তখন 'নিয়মতান্ত্রিক' পথে আন্দোলন মানেই হচ্ছে রাষ্ট্রের বাতলে দেওয়া পথে আন্দোলন করা। আর যাই হোক, বিদ্যমান রাষ্ট্র ও ক্ষমতাকাঠামো পরিবর্তনের লড়াই রাষ্ট্রের বাতলে দেওয়া 'নিয়মতান্ত্রিক' পথে হওয়ার কথা ছিল না। উপরন্তু কোনো জনগোষ্ঠীকে যখন সহিংস কায়দায় শাসন করা হয়, তখন জনগোষ্ঠীর অভ্যুত্থানের মধ্যেও 'নিয়মবহির্ভূত' সহিংস উপাদান জড়িয়ে পড়ে।

রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও 'নতুন' বয়ান

আন্দোলনকালে রাষ্ট্রীয় সহিংসতা এক নতুন স্তরে প্রবেশ করলেও আওয়ামী জমানার রাষ্ট্রীয় অপরাপর সহিংসতা থেকে আলাদাভাবে এটা পাঠ করা সম্ভব নয়। এ রেজিমের সহিংসতাকে বোঝা দরকার গুম, ক্রসফায়ার বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও গায়েবি মামলার ফেনোমেনোন দিয়ে। অর্থাৎ, আইনি ও বেআইনি–এ দুই তরিকার সহিংসতা দিয়েই বোঝা যাবে কীভাবে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের গণপরিসর থেকে রাজনীতি ও সম্ভাবনাকে গায়েব করে দিয়েছিল। আমরা একে চিহ্নিত করেছিলাম 'মারণ-রাজনীতি' (নেক্রোপলিটিক্স) নামে।[২১] আশিলে এম্বেম্বের ধারণা ব্যবহার করে আমরা বলেছিলাম, এ ধরনের রাষ্ট্রপ্রণালিতে আইনের শাসন, সহিংসতা এবং জরুরি অবস্থার ফারাক ঘুচে একাকার হয়ে যায়।[২২] জৈবরাজনৈতিক রাষ্ট্রে যেখানে মানুষের জীবন সার্বভৌম রাজনীতির কেন্দ্রীয় বিষয়, অর্থাৎ রাজনৈতিক কলাকৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিণত হয়, মারণ-রাজনৈতিক রাষ্ট্রে মউত হয়ে দাঁড়ায় সার্বভৌম ক্ষমতার প্রধান চরিত্র। অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষের জীবনকে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে এনে সার্বভৌমত্বের ব্যতিক্রমী ক্ষমতার অংশ হিসাবে 'হত্যাযোগ্য' প্রাণ তৈরি করার শাসনপ্রণালি এ নয়; বরং কাঠামোগত হত্যাযজ্ঞকে শাসনপ্রণালির অনিবার্য অনুষঙ্গে

শহিদ গোলাম নাফিজের নিথর দেহ
ছবি: জীবন আহমেদ

পরিণত করার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বন্দোবস্তই মারণ-রাজনীতি। এ ধরনের রাজনৈতিক বন্দোবস্তে পাইকারি হারে মউত উৎপাদন (large scale death) করাই সার্বভৌম ক্ষমতার প্রধান কাজ। কাজেই মারণ-রাজনীতির মানে হলো মউতের দোর্দণ্ডপ্রতাপের কাছে জীবনের পরাজয় (subjugation of life to the power of death)। এরকম রাজনৈতিক বাস্তবতায় মৃত্যুই 'নিয়ম', জীবন 'ব্যতিক্রম'।

যেভাবে জরুরি অবস্থার মতো আপৎকালীন ব্যবস্থাকে এখানে 'স্বাভাবিক' নিয়মে পরিণত করা হয়েছে, সাংবিধানিক শর্তের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা হয়েছে মৌলিক অধিকারের মতো নিঃশর্ত মানবীয় অধিকার, ক্রসফায়ারের মতো নৃশংস খুনের আইনগত ভিত্তি দেওয়া হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সন্দেহ/মনে হওয়ার ভিত্তিতে যেভাবে নাগরিকের দেহ তল্লাশি থেকে শুরু করে বাসাবাড়িতে বিনা পরোয়ানায় অনুপ্রবেশের অধিকার (প্রয়োজনে দরজা ভেঙে) সংরক্ষণ করে, এর নজির গোটা দুনিয়ায় বিরল। এরকম জৈবিক ও রাজনৈতিক অধিকারহীন নাঙ্গা জীবনযাপন করে বাংলাদেশের মানুষ। এর জন্য এমনকি সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যতিক্রমের কোটায় পড়ার প্রয়োজন পড়ে না। রাষ্ট্রীয় বর্ণবাদী একচেটিয়া সার্বভৌম ক্ষমতার কাছে এরকম উন্মোচিত নাঙ্গা জীবনের অধিকারীরাই আবার সমাজের জাতিগত-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক-লৈঙ্গিকভাবে ভিন্নধর্মীদের 'অপর' বর্গে চিহ্নিত করে, বর্ণবাদী সার্বভৌম ক্ষমতার মতাদর্শ সমাজে পুনরুৎপাদন করে এবং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জালের মতো বিস্তার ঘটায়। ফলে নাস্তিক-শিবির-সমকামী এমনকি রাজনৈতিক অধিকারের জন্য লড়াইরত নাগরিকও সার্বভৌম ক্ষমতার 'অপর' ও বধযোগ্য প্রাণ হিসাবে উন্মোচিত হয়।

আওয়ামী রেজিমের বিভিন্ন সময়ে নানা বর্গের মানুষকে যেভাবে 'বধযোগ্য' আকারে হাজির করা হয়েছিল, 'বধ'ও করা হয়েছিল এবং বিভাজিত সাংস্কৃতিক রাজনীতিকে ইস্তামাল করে সেই 'বধ'-এর রাজনীতির পক্ষে নানামুখী মহল থেকে সম্মতি উৎপাদন ও আদায় করা হয়েছিল, তার এক অনিবার্য পরিণতি আকারে দেখা দেয় জুলাই মাসের ম্যাসাকার/হত্যাযজ্ঞ। যখনই সমাজের কোনো বর্গের লোককে 'বধ' করা হয়েছে, তখন কোনো না কোনো 'বর্গ' তাতে সম্মতি প্রদান করেছে। নাস্তিক বলে কাউকে মেরে ফেললে যেমন একদিকে উল্লাস প্রকাশ করা হয়েছে, তেমনই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে বিরোধী দলের কেউ নিহত হলেও তেমনই উল্লাস প্রকাশ হয়েছে। বিগত ১৫ বছরে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর খায়েশের ওপর যেভাবে নাগরিকের হায়াত-মউত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল, এর চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে জুলাইয়ের হত্যাযজ্ঞ (ম্যাসাকার)।

আওয়ামী রেজিমের সামগ্রিক সহিংসতাকে আমলে না নিলে বোঝা যাবে না কীভাবে একটা রাষ্ট্র তার হাজারখানেক লোককে মাত্র ২০ দিনে স্রেফ রাস্তাতেই মেরে ফেলে! যে ধরনের মতাদর্শিক ও আইনি ব্যবস্থা দ্বারা এখানে বধযোগ্য প্রাণ তৈরি করা হয়েছে এবং সিভিল সোসাইটি থেকে এর সম্মতি আদায় করা হয়েছে, এর ধারাবাহিকতা ও সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে জুলাইয়ের রাষ্ট্রীয় সহিংসতা। হত্যা করে লাশ পুড়িয়ে ফেলা বা নির্বিকার ভঙ্গিতে গুলি করা বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সামনেই মোবাইল ফোনে দেখিয়ে 'একটা মরলে আরেকটা দাঁড়ায়' বলা–এগুলো সম্ভব হয়েছে এই দীর্ঘদিনের বাস্তবতায়।

তবে আন্দোলনের বিশেষ মুহূর্তে এসে রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও তাদের বয়ানের ক্ষেত্রে দুটি অভিনব বিষয় দেখা যায়। প্রথমত, নাগরিক আন্দোলন দমনে হেলিকপ্টার বা আকাশপথের ব্যবহার, হাসপাতালগুলোয় চিকিৎসা প্রদানে বাধা প্রদান এবং ছররা গুলিতে চোখে আক্রমণ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সহিংসতার এক নতুন পর্বে বাংলাদেশ প্রবেশ করে। *প্রথম আলো* এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, কাঁদানে গ্যাস ও ছররা গুলিতে চোখে আঘাত পেয়ে ১৭ জুলাই থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত চিকিৎসা নেন ৮৫৬ জন। তাঁদের মধ্যে ৭১৮ জনকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়; চোখে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে ৫২০ জনের; দুই চোখ নষ্ট ১৯ জনের। এক চোখ নষ্ট ৩৮২ জনের। এই ধরনের ঘটনার নজির আমরা আরও দুটি অঞ্চলে দেখতে পাই: কাশ্মীর ও ফিলিস্তিনে।[২৩] কাশ্মীর নিয়ে ২০১৬ সালের একটি প্রতিবেদন দেখুন, '…doctors at Srinagar's Shri Maharaja Singh hospital have treated at least 446 patients with injuries sus-

tained from being shot at with pellet guns, which have been used against protesters by Indian forces in the region.'[২৪] একইভাবে ইসরায়েলি স্নাইপারদের দেখা যায় ফিলিস্তিনিদের চোখ বরাবর গুলি করতে।

দ্বিতীয়ত, বয়ানের ক্ষেত্রে, পাকিস্তান আমলে আমরা দেখেছি, সরকার রাষ্ট্রীয় সহিংসতার প্রিটেক্সট হিসাবে আন্দোলনকারীদের কর্মকাণ্ডকে হাজির করেছে। অর্থাৎ, দায়টা আন্দোলনারীদের ওপর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এবার আওয়ামী লীগের তরিকা ভিন্নঃ তারা আন্দোলনকারীদের 'কোমলমতি শিক্ষার্থী' বলে 'নিষ্ক্রিয় সত্তা' বানিয়ে দিয়েছে। এক অদৃশ্য 'তৃতীয় পক্ষ' এই 'নিষ্ক্রিয় সত্তা'দের কাঁধে সওয়ার হয়ে জ্বালাও-পোড়াও করেছে। ফলে এ হত্যাযজ্ঞের দায় সেই 'তৃতীয় পক্ষে'র। বর্তমানে যাঁরা ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে একটু খোঁজখবর রাখেন, তাঁরা এই ধারার যুক্তির সঙ্গে পরিচিত। ইসরায়েলি বাহিনী একইভাবে দাবি করে, তাদের আসল টার্গেট হামাস। কিন্তু হামাস যেহেতু সাধারণ ফিলিস্তিনিদের 'হিউম্যান শিল্ড' হিসাবে ব্যবহার করছে, সেহেতু হামাসকে নিধন করতে গিয়ে সাধারণ ফিলিস্তিনিরাও নিহত হচ্ছেন।[২৫] আওয়ামী লীগের যুক্তিও একই ধারায় চলছেঃ যেহেতু অদৃশ্য 'তৃতীয় পক্ষ' কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাঁধে সওয়ার হয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে, সেহেতু তৃতীয় পক্ষকে দমন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা মারা যাচ্ছেন।

ফলে এটাও এক ট্র্যাজেডি। রীতিমতো সশস্ত্র সংগ্রাম করে যে জনপদ স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করেছিল, যারা জন্মের মুহূর্তে ফিলিস্তিনবাসীর মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিল, সেই রাষ্ট্র আজ ইতিহাসের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছিল। ফিলিস্তিনে গণহত্যাকারীদের কৌশল ও বয়ান দুটোই আত্মস্থ করে নিয়েছে এমন এক দল, যারা আবার মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে বলে এতদিন প্রচার করেছে।

অভ্যুত্থান-পরবর্তী সহিংসতা

অভ্যুত্থান-পরবর্তী পর্যায়ে, অর্থাৎ হাসিনার পলায়নের পরপরই সহিংসতার আরেক ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশে। এতে যেমন থানা পোড়ানো, আওয়ামী লীগের নেতাদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, শেখ মুজিবের ভাস্কর্য ভাঙচুর ও আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও স্মৃতিতে অগ্নিসংযোগ রয়েছে, তেমনই রয়েছে হত্যাকাণ্ড, মব লিঞ্চিং-এর ঘটনা। এর অধিকাংশ আসলে সাম্প্রতিক হত্যাযজ্ঞের 'প্রতিশোধ' বা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে গণপরিসরে বিবেচিত হয়েছে। মুজিবের ভাস্কর্য ভাঙচুর ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নের ভাঙচুর–দুটিই ছিল আওয়ামী ফ্যাসিবাদের মতাদর্শিক হাতিয়ার হিসাবে মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধকে ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া। যদিও অনেকে এতে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অবস্থান বা ভাস্কর্যবিরোধী অবস্থানকে ফোকাস করেছেন–এগুলোও যে ছিল না, তা অস্বীকার করার উপায় নেই; কিন্তু এগুলোকে আওয়ামী শাসনামলের 'ক্ষমতা'র প্রতীকের ভাঙচুর হিসাবে দেখাটাই বেশি যৌক্তিক। যে মুক্তিযুদ্ধ বা যে মুজিব শেখ হাসিনার আওয়ামী রেজিমের ফ্যাসিবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছিল, এই ভাঙার মধ্য দিয়ে যেন তার মুক্তি ঘটেছে। ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে ভাস্কর্যের ভাঙচুর মোটেও আচানক কিছু নয়। অভ্যুত্থান বা বিপ্লব-পরবর্তী দুনিয়াতে এটি হরহামেশাই হয়ে থাকে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে কলম্বাসের ভাস্কর্যের ওপর হামলাকে স্মরণ করা যেতে পারে।[২৬]

পাশাপাশি অভ্যুত্থান-পরবর্তী পর্যায়ে নানা ধরনের সহিংসতায় মানুষের অংশগ্রহণ যেন ছিল পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। কড়াইলের নিম্ন-আয়ের বসতির এক বাসিন্দার জবানে যেন এই পুরো সহিংসতার রূপ ধরা পড়েছিল, 'আফা, আমরার এলাকার নেতারে তো মাইনষে এমন মাইর দিছে, হে হের বউ-বাচ্চা লইয়া বাড়িঘর থুইয়া ভাগছে। এহন তো মাইর খাইবোই, এতদিন নেতাগিরি কইরা মাইনষের ট্যাহা মাইরা খাইছে আর দুতালা বিল্ডিং দিছে। এসি-মেসি লাগাইয়া কী বিশাল অবস্থা! এহন মাইনষে সুযোগ ফাইছে, এহন তো তারে মারবোই।'[২৭]

তবে এর মধ্যেই সংখ্যালঘুরাও আক্রমণের শিকার হন এবং এ নিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রোপাগান্ডা পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করে তোলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, সংখ্যালঘুদের যারা হামলার শিকার হয়েছিলেন, তারা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অর্থাৎ, এই হামলাগুলোর ধরন সাম্প্রদায়িক ছিল না, বরং অনেক বেশিই রাজনৈতিক।[২৮] তখন বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ দাবি করে, শেখ হাসিনার পতনের পর 'সাম্প্রদায়িক নৃশংসতা'র কবলে নয়জন হিন্দু প্রাণ হারান। পরবর্তী সময়ে *নেত্র নিউজের* অনুসন্ধানে দেখা যায়, 'ওই মৃত্যুর ঘটনাগুলোর নেপথ্যে সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় অভিসন্ধি থাকার কোনো স্পষ্ট লক্ষণ নেই। বরং নয়জনের মধ্যে সাতজনই রাজনৈতিক সহিংসতা, গণ-সহিংসতা ও বৈষয়িক অপরাধমূলক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।'[২৯] কিন্তু এটা বলার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক নাকি রাজনৈতিক–এমন কোনো সরল তুলনাও টানা হচ্ছে না। বিস্তারিত অন্যত্র আলোচনা করেছি।[৩০] কিন্তু এই পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়ে উঠে অভ্যুত্থান-পরবর্তী ৩/৪ দিনের পুলিশ প্রশাসনের অনুপস্থিতি। পুলিশ জুলাই-আগস্টের ২০ দিন যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, এর দরুন অভ্যুত্থান-পরবর্তী সব ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ তাদের ওপর পড়ে। ফলে তারা থানা থেকে পালিয়ে যান, কর্মস্থলে যোগ দিতে চাননি। থানাগুলো শূন্য হয়ে পড়ে বাংলাদেশের। তখন যে ধরনের সহিংসতার আশঙ্কা করা হয়েছিল, তা অদ্ভুতভাবে রুখে দিয়েছিল আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী-জনতা। হঠাৎ করে বাংলাদেশের সমাজ যেন আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। সহিংসতা, অপরাধ বা সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার আশঙ্কা থেকে মহল্লা, এলাকা, পাড়ায় সক্রিয়ভাবে পাহারা ও টহলের ব্যবস্থা করেন এলাকাবাসী ও শিক্ষার্থীরা। দিনের বেলায় ট্রাফিক কন্ট্রোল করেন শহরগুলোয়। পুরো এক সপ্তাহ বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আদতে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন শিক্ষার্থীরা।

যেকোনো অভ্যুত্থান ও আন্দোলন রাজপথে গড়ায় মূলত 'আইন' ভঙ্গ করেই। জুলাই অভ্যুত্থান এবং এর পরবর্তী পর্যায়ে আমরা এর চূড়ান্ত নমুনা দেখেছি। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানো এবং একই সঙ্গে আইনের দায়িত্ব পালন করা–দুটিই ঘটেছে আইনি প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে। এর নেতিবাচক হালতও ধরা হয়েছে কিছুদিন পরঃ মব ভায়োলেন্স বা মব লিঞ্চিং শুরু হয়েছে। 'জনতা' দ্রুত 'মব'-এ রূপান্তর হয়ে যায়। তবে বাংলাদেশে গণপিটুনি খুব একটা আচানক জিনিস নয়। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্যমতে, দেশে গত সাড়ে ছয় বছরে গণপিটুনিতে কমপক্ষে ২৮৬ জনকে হত্যা করা হয়েছে। এ মুহূর্তে অর্থাৎ, একদিকে অভ্যুত্থানে আইন নিজের হাতে নেওয়ার প্রবণতা এবং অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পুরোপুরি ফাংশনাল না হয়ে ওঠা, মব ভায়োলেন্স বা গণপিটুনি বা বিচারের ভার নিজের হাতে নিয়ে নেওয়ার প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। গবেষকরা অন্যান্য স্থানের অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন, যখন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ন্যায়বিচার পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হতে থাকে এবং প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্নীতিগ্রস্ত বলে জনমনে স্থায়ীভাবে জায়গা করে নেয়, তখন সে সমাজে বিচারের নামে গণপিটুনি বা আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এমনকি যখন লোকে মনে

করে, রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ দুর্বল হালতে রয়েছে বা অক্ষম অবস্থায় রয়েছে, তখনও এটা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৩১] ক্রসফায়ার বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে রাষ্ট্র যে তরিকায় জায়েজ করার চেষ্টা চালায়, সেই একই তরিকার ফলাফল বা অংশ হচ্ছে গণপিটুনি। বাংলাদেশে বিগত দেড় দশকে ক্রসফায়ার বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের পক্ষে যে ধরনের সম্মতি উৎপাদন করা হয়েছে, এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে মব ভায়োলেন্সকে জায়েজ করার সম্মতিমূলক উপাদান।

তথ্যসূত্র

১. Badruddin Umar, *The Emergence of Bangladesh*, Oxford University Press, 2004
২. ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস: এরশাদের সময়কাল*, আগামী প্রকাশনী, ২০১৭
৩. Ishtiaq Hossain, 'Bangladesh: Civil Resistance in the Struggle for Independence, 1948-1971', Maciej Bartkowski (ed.) *Recovering Nonviolent History: Civil Resistance in Liberation Struggles*, Viva Books, 2013, p. 199-216
৪. Henry David Thoreau, *Civil Disobedience*, 1849
৫. Zinn, H. (1997). *The Zinn Reader: Writings On Disobedience And Democracy*. Seven Stories Press.
৬. Sharp, G. (2012). From dictatorship to democracy: A conceptual framework for liberation (4th ed.). Serpent's Tail.
৭. Chenoweth, E., & Stephan, M. J. (2011). *Why civil resistance works: The strategic logic of nonviolent conflict*. Columbia University Press.
৮. Ammons, J. D. (2024). Institutional effects of nonviolent and violent revolutions. *World Development Perspectives*, 34, Article 100497.
৯. Chenoweth, E. (2023). The role of violence in nonviolent resistance. *Annual Review of Political Science, 26*
১০. Beck, Colin J., and others, *On Revolutions: Unruly Politics in the Contemporary World* (2022; online edn, Oxford Academic, 23 June 2022), https://doi.org/10.1093/oso/9780197638354.001.0001, accessed 17 Sept. 2024.
১১. কল্লোল মোস্তফা, 'হাসিনা সরকার যে কারণে এত অজনপ্রিয় ছিল', *ডেইলি স্টার বাংলা*, ১১ অক্টোবর ২০২৪
১২. Ortiz, I., Burke, S., Berrada, M., & Saenz Cortés, H. (2021). *World protests: A study of key protest issues in the 21st century*. Springer International Publishing.
১৩. *ডেইলি স্টার বাংলা*, বাসে আগুন দিতে ৪ লাখ টাকার চুক্তি, শ্রমিক লীগ নেতা গ্রেফতার, ২৪ জুলাই ২০২৪
১৪. এম সাখাওয়াত হোসেন, এভাবে আন্দোলন দমানোর পরিণতি খারাপ হতে পারে, *প্রথম আলো*, ২৫ জুলাই ২০২৪
১৫. Anam, M. Are we going to learn from our mistakes or keep repeating them? *The Daily Star,* July 26, 2024.
১৬. *দৈনিক আজাদ*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২
১৭. মহিউদ্দিন আহমদ, একটা অস্থির সময় পার করছি আমরা, *প্রথম আলো*, ২৭ জুলাই ২০২৪
১৮. মহিউদ্দিন আহমদ, *রাজনীতির মওলানা*, বাতিঘর, ২০২৩
১৯. Basu, S. (2023). *Intimation of revolution: Global sixties and the making of Bangladesh*. Cambridge University Press.
২০. Chakrabarty, D., Majumdar, R., & Sartori, A. (Eds.). (2007). *From the colonial to the postcolonial: India and Pakistan in transition*. Oxford University Press.
২১. সারোয়ার তুষার ও সহুল আহমদ, *মারণ-রাজনীতি: রাষ্ট্র ও সহিংসতার বয়ান*, আদর্শ, ২০২৪
২২. Achille Mbembe, *Necropolitics*, Duke University Press, 2019
২৩. আন্দোলনে গুলিতে চোখ নষ্ট ৪০১ জনের, *প্রথম আলো*, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪
২৪. আলজাজিরা, ২২ আগস্ট ২০১৬
২৫. Sohul Ahmed, 'Genocide' vs 'Self-defense': Reflection on the ongoing extermination in Gaza. *Bangla Outlook*. 2024, June 18.
২৬. 'Activists target removal of statues including Columbus and King Leopold II', *The Guardian*, 10 Jun 2020
২৭. সুলতানা, র. সহিংসতার এপিঠ-ওপিঠ এবং বয়ান ভাঙার রাজনীতি, *প্রথম আলো*, ২৮ আগস্ট ২০২৪।
২৮. পুলিশের তদন্তে জানা গেছে ৪ আগস্টের পর সাম্প্রদায়িক হামলা বলে দাবি করা ঘটনার মধ্যে ১ হাজার ২৩৪টি ঘটনা রাজনৈতিক এবং ২০টি ঘটনা সাম্প্রদায়িক ছিল। কমপক্ষে ১৬১টি দাবি মিথ্যা বা অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আক্রমণগুলো সাম্প্রদায়িকভাবে অনুপ্রাণিত ছিল না, বরং রাজনৈতিক প্রকৃতির ছিল। দেখুন: পুলিশ প্রতিবেদন বলছে বেশির ভাগ হামলাই সাম্প্রদায়িক নয়, রাজনৈতিক, *বাংলা ট্রিবিউন*, ১১ জানুয়ারি ২০২৫।
২৯. আকিব মো. সাতিল, 'নয় হিন্দুর হত্যাকাণ্ডে সাম্প্রদায়িক যোগসূত্র থাকার দাবি বিভ্রান্তিকর', *নেত্র নিউজ*, ১ নভেম্বর ২০২৪
৩০. সহুল আহমদ ও সারোয়ার তুষার, *সাম্প্রদায়িকতা : ক্ষমতা ও রাজনৈতিকতা*, ম্যাজিক লণ্ঠন, ২০২৩
৩১. Kloppe-Santamaría, G. (2020). *In the vortex of violence: Lynching, extralegal justice, and the state in post-revolutionary Mexico* (1st ed.). University of California Press

ইয়াসির আরাফাত

জুলাইয়ের রাজপথে: সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতা

গত ১৮ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট সরকার পতন পর্যন্ত ১৯ দিন এবং পরের দুদিনের টানা কাজের সময়টিকে সাংবাদিকজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলতে হবে। গুলি, টিয়ার গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড আর পালটাপালটি স্লোগান–এসবে দিনগুলো কেটেছে বলতে হবে। প্রথম এক-দেড়শ লোকের পেছন পেছন গণভবনে প্রবেশ, মোটরসাইকেলের বহর নিয়ে গুলিবর্ষণকারীদের সামনে থেকে দৌড়ে কপালগুণে বেঁচে যাওয়া, হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া সাউন্ড গ্রেনেডের লক্ষ্যবস্তু হওয়া, পুলিশের দুর্ব্যবহার এবং সেনাদের ধাওয়া খেয়ে ফেরাসহ বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হয়েছে এ কদিনে। রোদ-বৃষ্টির বাগড়া এবং আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা ও পুলিশের নানাবিধ খোঁচা দেওয়া মন্তব্য তো আছেই। এর আগে বহুবার মনে করেছি, যুদ্ধক্ষেত্রে রিপোর্টিং করতে যেতে চাই। সাংবাদিক আনিস আলমগীরের 'ইরাক রণাঙ্গনে' পড়ার পর আরও জোরদার হয়েছে সেই ইচ্ছা। এ যাত্রায় আন্দোলন কাভার করতে স্পটে গিয়ে কাজ করে সেই ইচ্ছার কিছুটা পূরণ হয়েছে বলা যায়। কোন শব্দটি গুলির, কোনটি টিয়ার গ্যাসের শেল আর কোনটি সাউন্ড গ্রেনেডের, তা শুনে বলে দিতে পারি এখন। এ লেখার শিরোনাম এমনভাবে দেওয়ার কারণ–৫ আগস্টের আগে সংবাদকর্মীদের একটা বড়ো অংশ যেভাবে দলীয় লেজুড়বৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, তা থেকে বেরিয়ে আসার নামগন্ধ দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, আগে যিনি নাশকতাকারী লিখেছেন, তিনি এখন তা লিখছেন না; কিন্তু সুযোগমতো নিরপেক্ষতার চাদরে অনেককিছু ঢেকে-চেপে যাচ্ছেন। সক্রিয় মনোভাবের সাংবাদিকতা তাঁদের দিয়ে হচ্ছে না।

১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে চিফ রিপোর্টার ফোনে বললেন, যত দ্রুত সম্ভব বাড্ডা-রামপুরা এলাকায় যেন যাই। পড়িমরি করে হাতিরঝিল ধরে গুলশান লাগোয়া পুলিশ প্লাজা পার হয়ে কিছুদূর যেতেই সামনে কাঁদানে গ্যাসের শেল আর সাউন্ড গ্রেনেডের মুহুর্মুহু শব্দ শুনে রাইডের মোটরসাইকেল ছেড়ে দিলাম। পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের পালটাপালটি ধাওয়া চলছিল, পুরো রামপুরা-বাড্ডা সড়ক রণক্ষেত্র। আন্দোলনকারীদের 'সর্বাত্মক অবরোধ' কর্মসূচিতে সেখানে ব্র্যাক ও ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিসহ স্থানীয় স্কুল-কলেজের

লেখক: স্টাফ রিপোর্টার, সমকাল ও আহ্বায়ক, বাংলাদেশ ফ্রি প্রেস ইনিশিয়েটিভ

সংসদ ভবন প্রাঙ্গণে আন্দোলনকারীরা,
৫ আগস্ট ২০২৪
(এপি ছবি/ফাতিমা তুজ জোহোরা)

শিক্ষার্থীরা নেমেছে। পুলিশ গুলি চালায় নির্বিচারে। দুই শিক্ষার্থী নিহত ততক্ষণে। অনেকে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত। 'গুলি ফুরিয়ে গেছে' বলে চিৎকার করে ফোনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানাচ্ছিলেন এক পুলিশ সদস্য, আরেক পুলিশ সদস্য কাঁদছিলেন। শিক্ষার্থীদের ইটপাটকেল নিক্ষেপে পুলিশ একটু পিছু হটতে লাগলে এক ফাঁকে শিক্ষার্থীদের মাঝে চলে গেলাম। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির বাড্ডা ক্যাম্পাসের অদূরে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস ভবনের নিচে পুলিশ গুলি ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়তে ছুড়তে একপর্যায়ে ছাত্র-জনতার শক্ত প্রতিরোধের মুখে পড়ে। ভবনটির ছাদে গিয়ে পোশাক খুলে মৃত্যুভয়ে অপেক্ষা করছিলেন ৫০ জনের বেশি পুলিশ সদস্য। হেলিকপ্টারে তাঁদের যখন উদ্ধার করা হচ্ছে, তখনো সামনের সড়কে চার-পাঁচ হাজার শিক্ষার্থী। একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী জিল্লুরের গুলিবিদ্ধ মরদেহ জাতীয় পতাকায় জড়িয়ে মিছিল করতে করতে ব্র্যাকের ক্যাম্পাস মেডিক্যালে নিলেন আন্দোলনকারী ব্র্যাক শিক্ষার্থীরা। সেখানে একদফা শিক্ষার্থীদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হলো, একজন আমাকে ভিডিয়ো নেওয়া থেকে থামালেন এবং চিৎকার করে বললেন, 'আমাদের গুলি করে মারে, আপনারা কিছুই দেখান না।' এতটা ক্ষোভ শিক্ষার্থীদের মাঝে, এর মধ্যেও অবাক করার বিষয়—তাঁরা ভবনে উঠে আটকে পড়া পুলিশ সদস্যদের আঘাত করতে পারতেন; কিন্তু তা করলেন না। এমন শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশ আর সরকারদলীয় লোকজনের গুলি ছোড়া শেষমেশ ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ডেকে আনল।

পরদিন যেতে হলো মিরপুর। আগের দিন বাড্ডা-রামপুরা সড়কসহ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলায় স্বৈরাচারের পেটোয়া বাহিনী ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে রাখে এবং ১৯ জুলাই ঢাকা গজবের নগরীতে পরিণত হয়। পুলিশ, বিজিবি ও র‍্যাবের সঙ্গে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ তো আছেই—যাত্রাবাড়ী, মিরপুর, ধানমন্ডি, উত্তরা ও বাড্ডা-রামপুরা সড়কসহ অনেক জায়গায় হেলিকপ্টার থেকেও আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার ওপর গুলি করা হয়। সেদিন মিরপুরের অবস্থা সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল। অথচ যা দেখলাম, তা পত্রিকার পাতায় ঠাঁই পেল না। এমন দুঃখ নিয়েই গেছে সেসব দিন। পুলিশ, বিজিবি ও আওয়ামী লীগ-যুবলীগ-ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর গুলির মুখেও আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা একটু পরপরই প্রতিরোধ গড়ে তুলছিলেন। যোগ দিল বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। পুরো মিরপুর হয়ে উঠল এক যুদ্ধক্ষেত্র। আকাশ থেকে হেলিকপ্টারে সাউন্ড গ্রেনেড ও গুলি ছোড়া হয়। ৩০-৩৫টি মোটরসাইকেলের বহর নিয়ে যুবকরা কাজীপাড়ার দিক থেকে গুলি করতে করতে এসে ১০ নম্বর গোল চত্বর হয়ে ১৩ নম্বরের দিকে চলে যায়। এ ঘটনাই সেদিন ছাত্র-জনতাকে যারপরনাই ক্ষুব্ধ করে তোলে। শাহ আলী প্লাজার পেছনের গলিতে দৌড়ে পালানোর পর একটি বিল্ডিংয়ের ছাদে আমরা ছয় সাংবাদিক কোনোরকমে ছবি-ভিডিয়ো নিতে লাগলাম। কারণ, ততক্ষণে অলিগলিতে ঢুকেও পুলিশ এবং দলীয় ক্যাডাররা গুলি করে যাচ্ছিল। একপর্যায়ে আমাদের ছাদ লক্ষ্য করে হেলিকপ্টার থেকে সাউন্ড গ্রেনেড মারা হলো। আমরা সিঁড়িঘরে আশ্রয় নিলাম। এ গলিতে যখন হুড়মুড় করে সবাই ঢুকছিলাম—লাল শার্ট পরা একটি ছেলে গুলি খেয়ে পড়ে গেল, একদম আমার পাশেই দৌড়াচ্ছিল সে।

সেদিন ছাদে বসে এক অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী হলাম, যখনই গলিতে ঢুকে গুলি চালানো হচ্ছিল, সতর্ক করতে বা ভয় কাটাতে সব বাসাবাড়ির নারীরা স্টিল-সিলভারের প্লেট-পাতিল পিটিয়ে অনবরত টুংটাং-টুংটাং আওয়াজ করছিলেন। এতেও আন্দোলনে সাধারণের সমর্থন স্পষ্ট হয়। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের গণভিত্তি নিয়ে। তাঁরা বলেছিলেন, বিএনপি-জামায়াত ঢুকেছে। আমিও মনে করি, বিএনপি-জামায়াতের লোকজন ছিল। এ নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু একই সঙ্গে এ আন্দোলনের মাঝে গণ-আন্দোলন চরিত্রও বজায় ছিল।

এদিন আটকে পড়ায় মিরপুর থেকেই পুরো ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ফোনে সংবাদ পাঠাই। কিন্তু পরদিন সকালে পত্রিকার পাতা খুলে স্বভাবতই মন খারাপ হয়ে যায়। তাণ্ডব চালানো হয়েছে, দুই পক্ষের সংঘর্ষে রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে এসব লেখা। স্বৈরাচারী সরকারের প্রবল চাপে এমনটি লেখার বিকল্প হয়তো ছিল না। কিন্তু একজন ক্ষুদ্র

সংবাদকর্মী হিসাবে মন খারাপ হওয়ার এরচেয়ে বড়ো উপলক্ষ্য আর নেই। দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের সাংবাদিক জাহিদ ভাই সারাদিন আমার সঙ্গেই ছিলেন। তাঁর পত্রিকায় নিউজ গেল 'মার্ডারার্স ম্যাডনেস ইন মিরপুর' শিরোনামে। কিন্তু আমার কাগজে পুরো জিনিসটি ঘুরিয়ে চরম সাদামাটা করে সংক্ষিপ্ত আকারে ছাপা হলো।

এরপর কর্মসূচি থাকলেই একদিন উত্তরা, আরেকদিন মিরপুর–এভাবে স্পট ডিউটি পড়তে থাকে। মিরপুরের একটা সুবিধা হলো–মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরকেন্দ্রিক; কিন্তু উত্তরায় এমনও দিন গেছে আজমপুর বাসস্ট্যান্ড, হাউজবিল্ডিং, জয়নাল মার্কেট, জমজম টাওয়ার চত্বর–সর্বত্র বিক্ষোভ এবং পুলিশ-আওয়ামী লীগের যৌথ হামলা। ২০ জুলাই শনিবার সাপ্তাহিক রিপোর্টিং মিটিং বাতিল হলো। হঠাৎ গরম হয়ে উঠলে সংবাদপত্রের নিউজরুমে এমন হয়।

> ইন্টারনেট না থাকায় ওই দিনগুলোয় ফোনে কথা বলা হতো প্রচুর। অন্তত ২৫/৩০ জন কাছের মানুষের সঙ্গে নিয়মিত ফোনে যোগাযোগ হতো। সারাদিন ঘুরে সন্ধ্যায় বা সন্ধ্যার পর অফিসে ঢুকে নিউজ জমা দিয়ে রাত করে ঘরে ফিরি আর লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে যায়। আবার সকালে উঠে রওয়ানা দিই মিরপুর অথবা উত্তরা। এভাবেই কটা দিন পার হচ্ছিল

অনুসন্ধানী বা বিশেষ প্রতিবেদনের চেয়ে ওই ইস্যুটি কতটা স্মার্টলি হ্যান্ডেল করা হলো, সেটি মুখ্য হয়ে ওঠে। দিন শেষে কেউ ব্যস্ত লাশের হিসাব ও নামপরিচয় মেলাতে। কেউ ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে অস্ত্রধারীর পরিচয় নিশ্চিতের চেষ্টা করছেন। সারাদিনের আন্দোলনে হাজারো ছবি-খবর–এর মধ্যে কোনটি গুরুত্ব পাবে, কোনটি প্রথম পাতায় ঠাঁই পাবে; তা নিয়ে সংবাদ ব্যবস্থাপকদের বিস্তর চিন্তা।

সংগৃহীত সংবাদ না প্রকাশের মনঃকষ্ট সেই দিনগুলোয় সাংবাদিকদের নিত্যদিনের হয়ে উঠেছিল। ১৯ জুলাইয়ের পর পরিস্থিতি কিছুটা অন্যদিকে মোড় নিতে শুরু করল। ২০ জুলাই উত্তরার আজমপুর রেলগেটে পুলিশের হাত থেকে অস্ত্র নিয়ে আওয়ামী লীগের এক কর্মী গুলি করছে, তা নিজ চোখে দেখলাম এবং অনেক ঝুঁকি নিয়ে ভিডিয়ো করলাম; কিন্তু সেটা সমকাল ফেসবুক-ইউটিউবে দেওয়া গেল না। ২১ জুলাই আবার মিরপুরে ডিউটি পড়ল। আমার একটা বিষয় ছিল–সারাদিন স্পটে থাকতাম, বিকাল নাগাদ অন্য হাউজের সাংবাদিকরা অফিসে ফিরতে শুরু করলেও আমি সন্ধ্যা পার করে অনেক ক্ষেত্রে আরও দু-এক ঘণ্টা পর অফিসে ফিরতাম।

২১ জুলাই রোববার। মিরপুর ১৩ নম্বরের দিকে সেনা সদস্যরা কারফিউ বাস্তবায়নে টহল দিচ্ছেন এবং কোথাও কোথাও লাঠিচার্জ করছেন। গোটা মিরপুরের রাস্তাঘাটে সুনসান নীরবতা, গাড়িঘোড়া নেই। তবে উৎসুক জনতা ও কিছু পথচারীর দেখা মিলছে। মিরপুর ১৩ নম্বরের দিক থেকে সেনা সদস্যরা গাড়িতে করে ক্যাপ পরা এক যুবককে নিয়ে এলেন। গাড়ির মেঝেতে বিধ্বস্ত অবস্থায় বসা যুবক মুশফিকুর হাসান সাকিব ছবি তুলতে মানা করছিলেন আর বলছিলেন, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে। ইন্টারনেটও নেই, কী করি কী করি। পরে ছবির বর্ণনা দিয়ে কয়েকজনকে ফোন করে তাঁর পরিচয় পেলাম। ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের কৃষিবিষয়ক সম্পাদক সাকিব সেনা টহলের সামনেও দাম্ভিকতা দেখিয়েছিলেন, সেনারা তাঁকে মারধর করে মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরের এদিকে গাড়িতে করে এনেছেন। একজন সেনা সদস্য বলে উঠলেন, 'ছাত্রলীগ...টাইম নাই।' নিজ কানে শুনলাম, তাও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। উপস্থিত আরও কয়েকজন সাংবাদিক ছিলেন, পরিচয় জানতে পেরেছি, তা কারও সঙ্গে না বলে চুপচাপ রইলাম। ছাত্রলীগ নেতাকে সেনা সদস্যরা এরকম মারধর করে গাড়িতে করে তুলে এনেছেন, এ তো বিরাট ঘটনা। অফিসে এসে দিনের বর্ণনামূলক স্টোরিটা জমা দিয়ে ছবিটা দেখালাম। কিন্তু অফিস ওইসময় ছবিটি ছাপানোর সাহস করল না। পরে কারওয়ান বাজারে একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার অফিস মারফত ছবিটি বর্ণনা দিয়ে বিদেশে থাকা জুলকারনাইন সায়েরকে (সামি) পাঠানো হলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যে পোস্ট করা হলো তাঁর ফেসবুকে। দেশে ইন্টারনেট নেই, প্রবাসীরা ধুমধাম শেয়ার করতে লাগলেন। অফিসটিতে আধা ঘণ্টারও কম সময় ছিলাম, তাতে দেখলাম শেয়ার ৫০০ ছাড়িয়েছে। ফেসবুকে হলেও ছবিটা অন্তত প্রকাশ করা গেল, এ আনন্দ নিয়ে ঘরে ফিরলাম।

২৩ জুলাই আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের গুলশানের বাড়িতে ব্রিফিং কাভার করতে গেলাম। সেখানে আনিসুলের পাশে মোহাম্মদ আলী আরাফাত, ফরহাদ হোসেন ও মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলও ছিলেন। সবাইকে খুব চিন্তিতই দেখাচ্ছিল। কিন্তু তারা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি, দিন দশেকের মাথায় ক্ষমতা ছেড়ে পালাতে হবে। প্রচুর সাংবাদিক ছিলেন–গাদাগাদি করে কেউ চেয়ারে, কেউ মেঝেতে বসে ব্রিফিং কাভার করতে হলো। একটি বিষয় দেখে খুব অবাক হলাম, অত্যন্ত সুন্দরী এক আপা সাংবাদিক হিসাবে সেদিন ছিলেন। দ্য ডেইলি পিপলস টাইমসের সাংবাদিক পরিচয়দানকারী আপা দুটি প্রশ্ন করলেন। এর মধ্যে একটি ছিল আন্দোলনের নামে বিএনপি ও জামায়াত-শিবিরের ইন্ধনে যে তাণ্ডব হচ্ছে, তা ঠেকাতে সরকার আরও কঠোর হবে কি না। ওই আপাকে আর কখনো দেখিনি ভেবে অবাক হয়েছিলাম। পরে আরও কয়েকজন সাংবাদিককে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁরাও কখনো দেখেননি জানালেন। এমন অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হচ্ছিল আন্দোলন চলাকালে।

এমনও দিন গেছে সকালে পুলিশের গুলিতে নিহতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে ইস্কাটনের বাসা থেকে যাত্রাবাড়ী গিয়েছি, সেখান থেকে তাঁর ভাইয়ের বাসা সিদ্ধিরগঞ্জের সানারপাড় গেলাম বৃষ্টিতে আধভেজা হয়ে। ভাইকে ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার পথে গুলিতে প্রাণ যায় ছানোয়ারের। যে ভাইকে ডাক্তার দেখাতে নিয়েছিলেন ছানোয়ার, সেই খোকনের বাসায় যেতে চাইলে তিনি পুলিশি চাপের কথা ভেবে ভয়ে সরে পড়েছেন। আবার কোন বিপদে পড়েন সাংবাদিককে তথ্য দিয়ে। বাড়ি ছেড়ে খালার বাসায় চলে গেলেন। অনেক বুঝিয়ে বলার আধা ঘণ্টা পর বাসায় ফিরলেন; কিন্তু কথা বলতে পারছিলেন না। প্রচণ্ড মানসিক চাপে ছিলেন বুঝতে পারছিলাম। খোকনের খালা জানালেন, গ্রামে ভাইয়ের দাফনের পর প্রশাসন ও পুলিশ কর্মকর্তারা বাড়িতে এসেছিলেন, তারা রীতিমতো শাসিয়ে

গেছেন। একজন খোকনকে বলেছেন, 'তোর জন্যই তো তোর ভাই মারা গেছে।' এখন এগুলো মিডিয়ায় যেন না জানায়, সেটাও বলে গেছেন স্থানীয় মাতব্বর-চেয়ারম্যান একসঙ্গে এসে। যাহোক, স্টোরির প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে দুপুরের মধ্যে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সামনে গিয়ে হাজির হয়েছি। তাদের দারুণ সব দেওয়াললিখন, গণমিছিল ও গায়েবানা জানাজা কাভার করে অফিসে ফিরেছি।

ইন্টারনেট না থাকায় ওই দিনগুলোয় ফোনে কথা বলা হতো প্রচুর। অন্তত ২৫/৩০ জন কাছের মানুষের সঙ্গে নিয়মিত ফোনে যোগাযোগ হতো। সারাদিন ঘুরে সন্ধ্যায় বা সন্ধ্যার পর অফিসে ঢুকে নিউজ জমা দিয়ে রাত করে ঘরে ফিরি আর লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে যায়। আবার সকালে উঠে রওয়ানা দিই মিরপুর অথবা উত্তরা। এভাবেই কটা দিন পার হচ্ছিল। ইস্কাটনের যে বাসায় থাকি, এর একদম উলটাপাশেই প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা আমির হোসেন আমুর আলিশান ডুপ্লেক্স বাড়ি। ৩ আগস্ট ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় দাঁড়াতেই দেখি আমুর বাড়ির গেটের দেওয়ালে কালো স্প্রে দিয়ে কেউ লিখে দিয়েছে, 'এখানে ফ্যাসিস্ট থাকে'। ছবি তুলে এক ছোটো ভাইকে পাঠালাম দেখতে। ওমা! কিছুক্ষণ পর দেখি ফাহাম আব্দুস সালাম সেটা তাঁর ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে দিয়েছেন। ভয় কাজ করছিল, ছবি দেখলেই বোঝা যায় উলটাপাশের বাসার উপরের তলা থেকে তোলা। খুঁজে বের করে কি না আবার। মুহূর্তেই ছবিটি শত শত শেয়ার হয়ে গেল।

আজ মিরপুর তো কাল উত্তরা–এভাবে কয়েকদিন ধরে কাজ করেছি। সর্বশেষ ৫ আগস্ট চিফ রিপোর্টার যথারীতি মিরপুর পাঠালেন। সকাল সকাল গিয়ে মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরের বেশ দূরেই দাঁড়াতে হলো। চারদিকের রাস্তায় কাঁটাতার ফেলে সেনাবাহিনীর ব্যারিকেড। সকালে মনে হচ্ছিল, আজ বোধহয় আর রাস্তায় নামতে পারবে না কেউ। এরকম এর আগেও কয়েকদিন মনে হয়েছে এবং বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এদিনও তাই হলো, চারপাশের কাঁটাতার ঘেঁষে লোকজন একটু একটু করে নামতে লাগল, এক দফার স্লোগান উঠতে লাগল। অরিজিনাল ১০ মোড়ে জমায়েতটা অস্বাভাবিক বেশি লাগল, সেনারা অ্যাকশনে না গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। তাতেই বুঝলাম, পরিস্থিতি ঘুরে গেছে নিশ্চয়। সকালেও যেই সেনারা ফাঁকা গুলি ছুড়ে লোকজনকে ছত্রভঙ্গ করলেন, তাঁরা এখন গাছাড়া। অরিজিনাল ১০ মোড়ের লোকজন ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল নিয়ে এগিয়ে গোলচত্বরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। একটু দ্রুত হেঁটে মিছিলের অগ্রভাগে যাওয়ার চেষ্টা করলাম, আরও অবাক হলাম গোলচত্বরে দাঁড়াতে দিচ্ছে না, মিছিল শাহবাগের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে আগারগাঁও-তালতলা পর্যন্ত হেঁটে একটা ব্যাটারিচালিত রিকশায় চড়ে মিছিলের একদম অগ্রভাগে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। বিজয় সরণিতে নামতেই দেখি সেনারা বাধা দিচ্ছেন, আর ছাত্র-জনতা ব্যারিকেড-পুলিশবক্স ভাঙচুর করছে সমানে। মিছিলের বড়ো অংশ শাহবাগে যাচ্ছে আর পাঁচ-ছয়শর মতো গণভবনমুখী রাস্তায় পা বাড়ালেন। সবাই যখন গণভবনের একেবারে কাছাকাছি, তখন একটি হেলিকপ্টার আকাশে উঠল। তাদের কয়েকজন তখন পিজিআর-এর দুটি এপিসির ওপর দাঁড়িয়ে পতাকা উড়িয়ে উল্লাস করছে। মুহূর্তে ৪০/৫০ জন গণভবনের সংসদসংলগ্ন গেট টপকে ভেতরে ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যরা ধাক্কাধাক্কি করতে করতে সেনাদের গেট খুলে দিতে বলল, তারা খুলে দিল। ব্যস ভেতরে ঢুকলাম প্রথম একশজনের মধ্যেই বলা যায়। সবাই সমানে গ্লাস ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করছে, আর আমি ছবি-ভিডিয়ো নিচ্ছি। তিন-চার যুবক একেবারে সামনের ঘাসে সিজদা দিলেন, একজন চিৎকার করে দোয়া করলেন, যাঁরা এ আন্দোলনে মারা গেছেন, তাঁদের তুমি শহিদি মর্যাদা দিও আল্লাহ!

গণভবনের মূল ভবনের ভেতরে ঢুকে হলরুমের পাশে খাবার রাখা ছিল মাংস, সবজি আর পোলাও। কয়েকজন তা খেতে শুরু করলেন, একজন ফ্রিজ থেকে মিষ্টির প্যাকেট এনে বিতরণ শুরু করলেন। সমকালের পরিচয়পত্র আমার গলায় ঝুলতে দেখে একজন চিৎকার করে বললেন, 'সমকালের সাংবাদিক ভাই, আপনি চলে এসেছেন, আসেন মিষ্টি খান।' অনেকটা জোর করেই তিনি আমাকে তিন-তিনটি মিষ্টি খাওয়ালেন। ভেতরে যে চেয়ারে প্রধানমন্ত্রী বসে ব্রিফিং বা সভা করতেন, সেখানে বসে ছবি নিচ্ছেন সবাই। কেউ বইপুস্তক বেছে বেছে নিয়ে নিচ্ছেন। শাড়ি-গয়না, ইলেকট্রিক জিনিসপত্র যে যার মতো করে নিচ্ছেন। হাঁস-মুরগি নিয়েছেন কেউ কেউ। দোতলায় প্রধানমন্ত্রীর শয্যা কক্ষে ঢুকে কয়েকজন তরুণ খাটে শুয়ে ছবি নিলেন। পিজিআর-এর সেনা কর্মকর্তারা ভাঙচুর ও জিনিসপত্র নিতে বারণ করছিলেন, কে শোনে কার কথা। শ্রীলঙ্কার ঘটনার ভিডিয়ো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখেছিলাম, নিজ দেশের ঘটনা স্বচক্ষে দেখলাম। এর মধ্যে এএফপি সাংবাদিক মোহাম্মদ আলী মাজেদের ফোন। ঢাকা ব্যুরো চিফ শফিকুল আলম ভাই তাঁর কাছ থেকে ফোন নিয়ে কথা বললেন এবং নিউজে কোট ব্যবহার করা যাবে কি না শুনে নিলেন। সবার আগে তাঁরাই সংবাদটি দিতে পেরেছিল, পরে জেনেছি। দোতলায় উঠে হাতের বামে আগাতেই সেনা কর্মকর্তা জাহিদ আমাকে থামালেন, বললেন, বেডরুমে যাওয়া যাবে না। সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে যারপরনাই অবাক হলেন তিনি। বললেন, আপনিও ঢুকে পড়েছেন? দেখেন কী তাণ্ডব চলছে, ভিডিয়ো করেন সব। গণভবন প্যালেস থেকে নেমে গাড়িবারান্দায় পা রেখে বামে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শরীয়তপুরের নেতা অভি খসরুর সঙ্গে দেখা। বয়সি একটা পাতাবাহার গাছের নিচে ঘাসে গা এলিয়ে বসে বন্ধু অনিক খানকে নিয়ে সিগারেট টানছেন। পেছনে একটা মুরগি হাতে এক যুবক বসা। আমাকে ভেতর থেকে আনা লজেন্স আর কোক সাধলেন। এ কেমন জমায়েত, কেউ সিজদা দিচ্ছে আবার কেউ সিগারেট টানছে আয়েশে। ভেতরে তখনো ব্যাপক ভাঙচুর চলমান। ততক্ষণে গণভবনমুখী জনস্রোত দীর্ঘ হয়েছে এবং সেখানে মানুষের সংখ্যা লাখের ধাক্কায়। বের হয়ে মূল সড়কে উঠতে বেশ বেগ পেতে হলো। পরদিন গণভবন, জাতীয় সংসদ ভবন ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সরেজমিন পরিদর্শন করলাম। এর পরদিন কেটে গেল ঢাকা মেডিকেলে।

মনের দুঃখের একটি কথা শেয়ার করে লেখাটি শেষ করতে চাই। সংবাদকক্ষে তখনকার দিনে আলাপ হতো শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকারী নাকি নাশকতাকারী লেখা হবে। যাঁরা এসব আলাপ করতেন, তাঁদের সিংহভাগ ভোল পালটে এখনো মিডিয়া হাউজগুলোয় রয়ে গেছেন। সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলামকে ডিবি পুলিশ তুলে নিয়ে মারধর করে পূর্বাচলে ৩০০ ফিট সড়কে ফেলে রেখে যায়। ওই ঘটনার দিন রিপোর্টার স্টোরিটি ঠিকঠাক লিখলেও ঊর্ধ্বতনদের দু-একজন বলছিলেন, কোটা আন্দোলনকারীদের মধ্যে অন্তর্কোন্দল চলছে, ফলে এক গ্রুপ আরেক গ্রুপের নেতাকে গুম-তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে রেখে গেছে। এমন সাংবাদিকও আমাদের মাঝে রয়েছেন। দিনশেষে আশার বিষয় হলো, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন হয়েছে। তাঁরা হয়তো একটি সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে কাজ করবেন। তবে মূল কাজটি গণমাধ্যমকর্মীদেরই করতে হবে। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কখনোই সরকার এনে দেবে না। তবে সহযোগী পরিবেশ তৈরিতে সরকার-রাষ্ট্র ভূমিকা রাখবে–এতটুকুই চাওয়া।

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে হতাহত সাংবাদিক

রক্তস্নাত গণ-অভ্যুত্থান দেখল বাংলাদেশ। এটি ছিল দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙার এক অভাবনীয় গণবিপ্লব। ফ্যাসিবাদী শাসক আমৃত্যু ক্ষমতায় থাকবে এবং তার পতন ঘটানোর সাধ্য কোনো শক্তির নেই–এমনটাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন সবাই। সাধারণভাবে যা কল্পনা করা যায়নি, সেটিই এখন সত্য। দেড় দশক ধরে নিপীড়িত মানুষের ক্ষোভের বারুদ বিস্ফোরিত হয়েছে চব্বিশের জুলাই-আগস্টে। বিপ্লবীদের ভাষায় ৩৬ জুলাইয়ে। গণবিস্ফোরণের মুখে করুণ পতনই শুধু নয়, দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে দুর্বিনীত ও ক্ষমতার দম্ভে আচ্ছন্ন এক শাসককে।

আবু সাঈদ, মুগ্ধসহ প্রায় দুই হাজার ছাত্র-জনতা শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক ও মানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। রক্তে ভেসেছে পিচঢালা রাজপথ। অঙ্গ হারিয়ে, দগদগে ঘা নিয়ে অসহ্য যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছেন প্রায় ২০ হাজার বিপ্লবী। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে বাকি জীবনের জন্য অন্ধকার পৃথিবীতে চলে গেছেন চার শতাধিক জানবাজ। পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব ও নিকটজনকে হারিয়ে পরিবারে পরিবারে চলছে শোকের মাতম।

শহিদদের কাতারে যেমন শিশু, কিশোর, আবালবৃদ্ধবনিতা আছেন; তেমনই রয়েছেন নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। রয়েছেন বেশ কজন সংবাদকর্মী। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁদের জীবন দিতে হয়েছে। ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পুলিশের গুলিতে ছয়জন সাংবাদিক প্রাণ হারিয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ৩৫০ সাংবাদিক। তাঁদের অনেকে পঙ্গুত্বের মুখে পড়ে কাতরাচ্ছেন বিছানায়। জীবনবাজি রেখে ফ্যাসিবাদের পতন আন্দোলনে যাঁরা অংশ নিয়েছেন, তাঁদের সংবাদ পাঠক-দর্শককে জানাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন এই সংবাদকর্মীরাও। দেশের ও বহির্বিশ্বের পাঠক-দর্শকের কাছে শিক্ষার্থী ও স্বাধীনতাকামী মানুষের আত্মত্যাগ, সাহসিকতা ও বীরত্বের গল্পগুলো তুলে ধরেছেন তাঁরা। সাংবাদিক নামধারী গুটিকতক ফ্যাসিবাদের দোসর ছাড়া অধিকাংশ গণমাধ্যমকর্মী আন্দোলনের পুরো সময় শিক্ষার্থী ও জনমানুষের পাশেই ছিলেন। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যে নিষ্ঠুর সহিংসতা হয়েছে, তা প্রকাশ ও প্রচার করতে নিজেদের সক্ষমতা ও মেধার পূর্ণ ব্যবহার করেছেন।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট; সাবেক সভাপতি, বিএফইউজে এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট

শহিদ সাংবাদিকদের ছোটো ছোটো সন্তানরা পিতাকে হারিয়েছে। স্ত্রী বিধবা হয়েছেন। স্বজনরা তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়ে আজ পাগলপারা। পরিবারগুলো তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম উদ্‌বিগ্ন। অনেক শহিদ সাংবাদিক পরিবারে এখনো চলছে শোকের মাতম। গুরুতর আহত সাংবাদিকদের পরিবার অসহায়-অনিশ্চিত জীবনের মুখোমুখি।

হতাহত সাংবাদিকরা ছিলেন নিরপরাধ। তাঁরা পেশাগত দায়িত্ব পালনে রাজপথে ছিলেন। পুলিশের বুলেটে ১৮ জুলাই প্রথম শহিদ হন সাংবাদিক হাসান মেহেদী। তিনি নিউজ পোর্টাল ঢাকা টাইমসে কর্মরত ছিলেন। ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে খবর সংগ্রহের সময় তিনি গুলিবিদ্ধ হন। একই দিনে ভোরের আওয়াজ নামের একটি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিবেদক শাকিল হোসাইন শহিদ হন উত্তরায়। ওইদিন নয়া দিগন্তের সাংবাদিক হাসান মেহেদী। জাহিদের এখন আক্ষেপ–'আমাকে সতর্ক করে ভাই নিজেই পরপারে চলে গেলেন।' ১৮ জুলাই সংবাদ সংগ্রহের কাজে গিয়ে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন ঢাকা টাইমসের সিনিয়র রিপোর্টার হাসান মেহেদী।

গুলিবিদ্ধ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই হাসান মেহেদী যাত্রাবাড়ী এলাকায় পেশাগত দায়িত্বে ছিলেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন ঘটনার ভিডিয়ো ফুটেজ নেন। একাধিক পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে তিনি গল্পও করেন সেদিন। দৈনিক বাংলাদেশের আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক ইমান হোসেন ইমন ছিলেন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি বলেন, 'বিকাল সাড়ে ৫টার পর যখন পুলিশের একটি এপিসি আসে এবং আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়, তখন পুলিশের সঙ্গে দৌড়ে

> সাংবাদিক নামধারী গুটিকতক ফ্যাসিবাদের দোসর ছাড়া অধিকাংশ গণমাধ্যমকর্মী আন্দোলনের পুরো সময় শিক্ষার্থী ও জনমানুষের পাশেই ছিলেন। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যে নিষ্ঠুর সহিংসতা হয়েছে, তা প্রকাশ ও প্রচার করতে নিজেদের সক্ষমতা ও মেধার পূর্ণ ব্যবহার করেছেন

সিলেট প্রতিনিধি আবু তাহের মুহাম্মদ তুরাব পুলিশের গুলিতে নির্মমভাবে শাহাদতবরণ করেন। ২ আগস্ট তাহির জামান প্রিয় নামের আরেক ভিডিয়ো সাংবাদিক গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে। এর দুইদিন পর ঠিক গণ-অভ্যুত্থানের দিন ৫ আগস্ট সিরাজগঞ্জে দৈনিক খবরপত্রের সাংবাদিক প্রদীপ কুমার ভৌমিক প্রাণ হারান। মো. সোহেল আখঞ্জি নামের আরেক সাংবাদিক জীবন দিয়েছেন হবিগঞ্জে। তিনি স্থানীয় দৈনিক লোকালয় পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার। নিহত সাংবাদিকদের মধ্যে পাঁচজন পুলিশের গুলিতে এবং অপরজন হামলার শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন।

৩০ অক্টোবর বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সমস্যাগ্রস্ত সাংবাদিকদের মধ্যে কল্যাণ অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, 'বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শহিদ সাংবাদিকদের পরিবার ও আহতদের পাশে থাকবে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট। এ আন্দোলনে যেসব সাংবাদিক শহিদ ও আহত হয়েছেন, তাঁরা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সরকারের পক্ষ থেকে তাদের সম্মান জানানো হবে।'

উপদেষ্টা বলেন, 'সমস্যাগ্রস্ত ও গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকদের সহায়তা দেওয়া সরকারের দায়িত্ব। যেসব সাংবাদিক-পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে, সেসব পরিবারকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় নিজেদের অংশ মনে করে। সেই অংশীদারত্বের জায়গা থেকে মন্ত্রণালয় সাংবাদিকদের পাশে দাঁড়িয়েছে।'
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অসহযোগ কর্মসূচি চলার সময় সিরাজগঞ্জে প্রদীপ কুমার ভৌমিক নামের এক সাংবাদিক নিহত হয়েছেন ৪ আগস্ট। একই দিন রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় অন্তত ২৩ সাংবাদিক আহত হন।

বাবা হারিয়ে দিশেহারা অবুঝ নিশা ও মেহের

কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে সংঘাতময় পরিস্থিতিতে ঢাকায় না আসতে ছোটো ভাই জাহিদ হাসান আশিককে সতর্ক করেছিলেন দৌড়ে ভিডিয়ো করছিলেন হাসান মেহেদী। একপর্যায়ে এপিসি থেকে ছোড়া শটগানের গুলিতে বিদ্ধ হন মেহেদী।'

ইমন বলেন, 'পুলিশের গুলিতেই হাসান মেহেদী নিহত হয়েছেন। আমি অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পাই। গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রায় ১০ মিনিট রাস্তায় পড়েছিলেন হাসান। এরপর আমরা ঢাকা মেডিক্যালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।'

হাসান মেহেদী ঢাকা টাইমসের হয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বিটে নিয়মিত দায়িত্ব পালন করতেন। এর আগে তিনি বেসরকারি টেলিভিশন নিউজ টোয়েন্টিফোর, কালের কণ্ঠ ও বাংলাদেশের আলোয় কাজ করেছেন।

ঘটনার আগের দিন অর্থাৎ ১৭ জুলাই ছোটো ভাই আশিককে ফোনে হাসান বলেন, 'এখন ঢাকায় আসিস না। পরিস্থিতি ভালো না। সাবধানে থাকিস। এখন কোনো কাজ করা লাগবে না।' ১৯ জুলাই ঢাকা টাইমস কার্যালয়ে হাসান মেহেদীর জানাজা শেষে কান্নায় ভেঙে পড়েন আশিক। বারবার বলছিলেন, 'আমাকে সতর্ক করে আমার ভাই নিজেই চলে গেলেন। আমার ভাইকে কোথায় পাব?'

হাসান মেহেদী রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী কলেজ থেকে অনার্স করেছেন। তাঁর দুই শিশুসন্তান রয়েছে। বড়ো মেয়ের বয়স সাড়ে তিন বছর। ছোটো মেয়ের বয়স মাত্র সাত মাস। ছোটো ভাই জাহিদ বলেন, 'নিশা ও মেহের ছিল আমার ভাইয়ের কলিজার ধন। তাদের নিয়েই ছিল তাঁর স্বপ্নের স্বর্গ। অবুঝ সন্তানগুলো জানেও না ওদের বাবা আর নেই।'

পটুয়াখালীর বাউফলের হোসনাবাদ গ্রামে দাফন করা হয় হাসান মেহেদীর লাশ। স্ত্রী ও দুই কন্যাসন্তান নিয়ে ঢাকায় থাকলেও সাংবাদিক হাসান মেহেদী মা-বাবার ভরণপোষণ ও ছোটো দুই ভাইয়ের পড়ালেখার দায়িত্বও সামলে আসছিলেন। তাঁর আয়ের টাকায় পরিবারটির যাবতীয় ব্যয়নির্বাহ হতো। তাঁর অবুঝ শিশু দুটি এখনো জানেই না তাদের পরম আদরের বাবা আর বেঁচে নেই। স্ত্রী ফারহানা ইসলাম পপি গৃহিণী। পরিবারের কর্তাটির নির্মম মৃত্যু দুই সন্তানসহ এই মায়ের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে দিয়েছে।

আদরের বড়ো ছেলের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে বাক্‌রুদ্ধ মেহেদী হাসানের সত্তরোর্ধ্ব অসুস্থ বাবা মো. মোশাররফ হোসেন হাওলাদার। বাক্ হারিয়েছেন বৃদ্ধ মা মাহমুদা বেগমও। বাবা মোশাররফ হোসেনের এককে করে পাঁচবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। রয়েছে ডায়াবেটিস ও উচ্চরক্তচাপ। মাসে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকার ওষুধ নিতে হয় তাঁকে। এই ওষুধের ব্যয় সামলাতেন হাসান মেহেদী।

অন্যদিকে মা মাহমুদা বেগমও বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছেন দীর্ঘদিন। এমন অবস্থায় পরিবারটি পড়েছে চরম অনিশ্চয়তায়। দাফনকালে ছেলে হারানো মাহমুদা বেগমের প্রশ্ন ছিল–সাংবাদিকতা কি অপরাধ? যে প্রশ্নের উত্তর মেলেনি।

শহিদ শাকিলের বাবার প্রশ্ন–এখন কে আমাদের দেখবে?

২৩ বছরের টগবগে তরুণ শাকিল হোসেন। মা-বাবার একমাত্র ছেলে। তিন বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে ছিলেন সবার ছোটো। মানারাত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ তৃতীয় বর্ষের মেধাবী ছাত্র। টিউশন করে নিজের খরচ নিজেই চালাতেন। পড়াশোনার পাশাপাশি সাংবাদিকতা করার নেশা পেয়ে বসে। ভোরের আওয়াজ নামে একটি দৈনিক পত্রিকায় সাংবাদিকতা করতেন। ছিলেন গাজীপুরের গাছা থানা প্রতিনিধি। এছাড়া ফ্রি ব্লাড ক্যাম্পিংসহ বেশকিছু সামাজিক কাজে জড়িত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও নিজ এলাকায় ছোটো-বড়ো সবার বিপদে দৌড়ে যাওয়া শাকিল ছিলেন সবার প্রিয়মুখ ও অকৃত্রিম বন্ধু। আট বছর আগে স্ট্রোকের পর প্যারালাইজড হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকা অসুস্থ মাকে শাকিল নিয়মিত নিজ হাতে খাইয়ে দিতেন। বড়ো তিন বোনের বিয়ে হওয়ার পর তিনি সবসময় মা-বাবার বিপদ-আপদে পাশে ছিলেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহিদ হয়েছেন শাকিল। অসুস্থ মা একমাত্র ছেলেকে হারানোর শোকে এখন ঠিকমতো খেতেও পারছেন না। সারাক্ষণ শাকিলের জামাকাপড় বুকে জড়িয়ে শুধু আহাজারি করছেন আর বলছেন, 'আমার শাকিলরে গুলি করে মাইরা ফালাইছে। আমার শাকিল আর ফিরা আইবেনাগো। এখন আমারে কে খাইয়ে দিবেগো?'

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো ক্লিপে শাকিল হোসেনকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলের সামনের সারিতে স্লোগান দিতে দেখা গেছে। ১৮ জুলাই বিকাল ৪টার পর উত্তরা বিএনএস সেন্টারের সামনে শাকিল তাঁর ফেসবুক আইডি থেকে লাইভ করেছিলেন। পুলিশের টিয়ার গ্যাসের শেল ও গুলি ছোড়ার দৃশ্য দেখা গেছে সেই লাইভে। এর কিছুক্ষণ পরই মোবাইল ফোনে শাকিলের গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর সংবাদ পান বলে জানান তাঁর বাবা।

শহিদ শাকিল হোসেনের বাবা মো. বেলায়েত হোসেন বলেন, ১৮ জুলাই লক্ষ্মীপুর জেলার গ্রামের বাড়িতে থাকাবস্থায় আসরের নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর মোবাইল ফোনে উত্তরা বিএনএস সেন্টারের সামনে পুলিশের গুলিতে শাকিলের নিহত হওয়ার সংবাদ পাই। ফোন করেছিলেন শাকিলের পরিচিত বড়ো ভাই ফুয়াদ আলম। তাঁর বাসাও টঙ্গীতে শাকিলদের এলাকায়ই।

ফুয়াদ আলম সাংবাদিকদের বলেন, শাকিল খুব ভালো ছেলে ছিল। সে আমার এলাকার ছোটো ভাই। আমরা একসঙ্গেই বড়ো হয়েছি। আমরা একসঙ্গে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলতাম। শাকিল খেলাধুলায় ভালো ছিল। নিরাপদ সড়ক আন্দোলন থেকে শুরু করে সব আন্দোলন-সংগ্রামে শাকিল সক্রিয় ছিল। সমাজে সে ভালো ছেলে হিসাবে পরিচিত ছিল সবার কাছে। ঘটনার দিন উত্তরা বিএনএস সেন্টারের সামনে শাকিল পুলিশের গুলিতে আহত হওয়ার খবর পেয়ে দ্রুত উত্তরা আধুনিক মেডিক্যাল হাসপাতালে যাই। সেখানে গিয়ে শুনি চিকিৎসক শাকিলকে মৃত ঘোষণা করেছেন। আমি তখন শাকিলের বাবার মোবাইল নম্বরে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ জানাই।

শাকিলের বাবা বেলায়েত হোসেন জানান, টঙ্গী ও মানারাত বিশ্ববিদ্যালয়ে শাকিলের পৃথক তিনটি জানাজা শেষে পরদিন সকাল ৯টায় তাঁর লাশ গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুর সদরের কাকিলাতলীতে পৌঁছায়। সেখানে সর্বশেষ জানাজা দিয়ে তাঁর দাদা-দাদির কবরের পাশে দাফন করা হয়েছে।

শহিদ শাকিল হোসেনের বাবা মো. বেলায়েত হোসেন (৬৭) ও মা পারভীন আক্তার (৫২) বড়ো তিন মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার পর একমাত্র ছোটো ছেলেকে নিয়ে থাকতেন টঙ্গীর হোসেন মার্কেট বীর মুক্তিযোদ্ধা মহিউদ্দিন বাচ্চু রোডের একটি ভাড়া বাসায়। দীর্ঘ ৩৭ বছর এ এলাকায় বসবাস করে আসছেন তাঁরা। শাকিলের জন্ম, পড়াশোনা এখানেই। স্থায়ী নিবাস লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার কাকিলাতলী গ্রামে।

শহিদ শাকিলের বাবা বেলায়েত হোসেন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আমাদের বড়ো তিন মেয়ের পর শাকিল ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার। মেয়েরা বিয়ের পর স্বামীর সংসার করছে। শাকিল সবসময় আমার ও তাঁর মায়ের কাছে ছিল। আমাদের দেখাশোনা করত। এখন কে আমাদের দেখবে? কে আমাদের পাশে থাকবে?'

শহিদ শাকিল হোসেনের বাবা বলেন, 'শুধু আমার ছেলের হত্যাকারী নয়, এই আন্দোলনে সব হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার করতে হবে। এই শহিদদের রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর হিসাবে মর্যাদা দিতে হবে।'

হানিমুনের আগেই বিধবা হলেন তুরাবের স্ত্রী তানিয়া

লন্ডনি কন্যা বিয়ে করেছিলেন সিলেটের ফটোসাংবাদিক এটিএম তুরাব। তিন মাস আগে বিয়ে করেছিলেন তিনি। লন্ডন যাওয়ার সব প্রক্রিয়া এগিয়েও রেখেছিলেন। দুই থেকে আড়াই মাসের মধ্যে তাঁর লন্ডন পাড়ি দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর আগেই গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয় তাঁকে। এমন ঘটনায় হতবাক তাঁর পরিবার। শোক কাটাতে পারছেন না। লন্ডনে থাকা সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী তানিয়া ইসলামও বিয়ের তিন মাসের মধ্যে হয়ে গেলেন বিধবা। কাঁদছেন তিনিও। স্বজনদের মধ্যে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

তুরাব কাজ করতেন দৈনিক জালালাবাদ ও নয়া দিগন্ত পত্রিকায়। এর আগে বিয়ানীবাজারে সাংবাদিকতায় সক্রিয় ছিলেন। কয়েক বছর আগে এসে সিলেটের সাংবাদিকতায় যুক্ত হন। নগরের যতরপুরে পরিবার-সহ বসবাস করতেন তুরাব। পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, এটিএম তুরাব ২০২৪ সালের ১৩ মে বিয়ে করেছিলেন। কনে 'লন্ডনি কইন্যা' তানিয়া ইসলাম। তাঁদের বাড়ি জগন্নাথপুরে। পারিবারিকভাবে তাঁদের বিয়ে হয়। অনেকের কাছে বড়ো আদরের ছিলেন তুরাব। এ কারণে বিয়েতে সিলেটের সাংবাদিকদের অংশগ্রহণ ছিল বেশি। বিয়ের পর কনে তানিয়া ইসলামের সঙ্গে ১৮ দিনের সংসার। এরপর কনে চলে যান লন্ডনে। গিয়ে এটিএম তুরাবকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

ঘটনার দিন ছিল শুক্রবার, ১৯ জুলাই। নগরের কোর্ট পয়েন্টে জুমার নামাজের পর বিক্ষোভ হবে। খবর পেয়ে তুরাব বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বাসা থেকে বের হয়ে যান। ছিলেন নগরের কোর্ট পয়েন্ট এলাকায়। সহকর্মীরা জানিয়েছেন, বিক্ষোভ শুরুর পরপরই ফটোসাংবাদিকরা ছবি তুলছিলেন। এমন সময় গুলি, সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার গ্যাসের শেল ছোড়া শুরু হয়। এতে গুলিবিদ্ধ হন তুরাব। এ

দৃশ্য দেখে এগিয়ে যান ফটোসাংবাদিকরা। তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করেন।

সাংবাদিক তুরাবের বড়ো ভাই আবুল হাসান মো. আজরফ জানিয়েছেন, 'তুরাবকে লন্ডনে নিয়ে যেতে ওখান থেকে তাঁর স্ত্রী প্রক্রিয়া এগিয়ে রেখেছিলেন। দুই থেকে আড়াই মাসের মধ্যে লন্ডনে চলে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর আগেই গুলিতে নির্মমভাবে খুন হতে হলো তাঁকে।' এ ঘটনায় তাঁদের পরিবারে শোকের মাতম চলছে। তুরাবের জন্য লন্ডনে থাকা স্ত্রীও আর্তনাদ করছেন। এমন ঘটনায় তাঁদের পরিবার পুরোপুরি বিপর্যস্ত। আমেরিকায় থাকা বড়ো বোন ও ফ্রান্সে থাকা বড়ো ভাইও কাঁদছেন। সান্ত্বনার কোনো ভাষা নেই বলে জানিয়েছেন ভাই আবুল হাসান।

তুরাব নিহত হওয়ার ঘটনায় সিলেটের সাংবাদিকদের নিয়ে কোতোয়ালি থানায় মামলার এজাহার দাখিল করেন বড়ো ভাই আবুল হাসান মো. আজরফ। পুলিশ এ অভিযোগটিকে সাধারণ ডায়ারি হিসাবে গ্রহণ করে। ঘটনাটি এখন তদন্ত করছে পুলিশ। পুলিশ সদস্যসহ কয়েকজন গ্রেফতারও হয়েছেন। সিলেটের নতুন পুলিশ কমিশনার মো. জাকির হোসেন খান নগরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেন। তিনি বলেন, কী কারণে সাংবাদিক তুরাব নিহত হয়েছেন, এর তদন্ত চলছে। লাশের ময়নাতদন্তও হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও তদন্ত অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোতোয়ালি থানার ওসি মঈন উদ্দিন শিপন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এ ঘটনায় আগেই একটি মামলা করা হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে যে এজাহার দেওয়া হয়েছে, সেটি সাধারণ ডায়ারি হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। আগের মামলার সঙ্গে সংযুক্ত করে এ অভিযোগটিরও তদন্ত করা হবে।

তাহির জামান প্রিয়

দিনটি ১৯ জুলাই ২০২৪। ঢাকার অন্যান্য জায়গার মতো কোটা সংস্কারের আন্দোলন ঘিরে ধানমন্ডির সায়েন্স ল্যাব মোড়ে সংঘর্ষ চলছিল। এ সময় পেশাগত দায়িত্ব পালন করছিলেন সাংবাদিক তাহির জামান প্রিয়। বিকাল ৫টায় সেখানে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। পরদিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে সহকর্মী ও বন্ধুরা তাঁর লাশ শনাক্ত করেন। প্রিয় ঢাকায় থাকলেও তাঁর পরিবারের বাস রংপুর শহরে। মা শামসী আরা জামান আর চার বছরের মেয়ে পদ্মপ্রিয় পারমিতাকে নিয়ে ছিল তাঁর সংসার।

সম্প্রতি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজন করে গণ-অভ্যুত্থানের গানের অনুষ্ঠান 'আওয়াজ উঠা'। সেগুনবাগিচায় শিল্পকলা একাডেমির নন্দনমঞ্চে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শহিদ সাংবাদিক তাহির জামান প্রিয়র মা শামসী আরা জামান। সাংবাদিক তাহির জামান প্রিয়র মা বলেন, 'ও জীবনটা গুছিয়ে এনেছিল। মেয়েকে স্কুলে দিয়েছিল। ঢাকায় নতুন চাকরিতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। একটা স্বপ্ন ছিল। এখন ওর ছোট্ট সন্তানটাকে বড়ো করাই আমার স্বপ্ন। ওর মতো ছেলেদের জন্য আমি সুস্থ-সুন্দর একটা সমাজ চাই।'

ছেলের কথা বলতে গিয়ে প্রায় বাক্‌রুদ্ধ মা জানান, তাঁর ছেলে প্রচুর বই পড়তেন। দেশ-জগতের খবর রাখতেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। স্বপ্ন ছিল চলচ্চিত্র নির্মাণের। তাহির জামান প্রিয়কে দাফনের তিনদিন পর রাত ৩টায় তাঁদের রংপুরের বাসার দরজা ভেঙে একদল পুলিশ ভেতরে প্রবেশ করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে বলেও জানান শামসী আরা জামান। কিছুদিন পর খবর আসে, পুলিশ তাঁকেও তুলে নিয়ে যেতে পারে। ছোটো নাতনি আর ৯ বছরের মেয়েকে নিয়ে তখন ভয়ের ভেতর বসবাস করতে হয়েছে বলে জানান তিনি।

প্রিয়র চার বছরের মেয়ের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমার ছোট্ট নাতিটাকে স্কুলে নিয়ে যাই, সামনে পুলিশের গাড়ি দেখলে ও রিকশায় দাঁড়িয়ে বলে, 'তোমরা আমার বাবাকে মেরেছ! তোমরা ভালো না, পচা!' আমি ওর কথাটা শুনে অবাক হই। রিকশা এগিয়ে নিয়ে গেলে পুলিশ সদস্যরা বলেন, আমরা তোমার বাবাকে মারিনি।"

শামসী আরা জামান জানান, একদিন তিনি নাতিকে নিয়ে কোথাও গেছেন। সেখানে দুজন পুলিশ অফিসার হোটেলে ঢোকেন। এটা দেখে তাহিরের মেয়েও পুলিশের পিছে পিছে যেতে চায়। কেন যাচ্ছ জানতে চাইলে বলে, 'ওদের জিজ্ঞেস করব কেন আমার বাবাকে মেরেছে। আমার প্রিয় বাবা আমার কাছে আসে না। প্রিয় বাবা আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে।'

প্রিয়র মা জানান, তিনি ঢাকায় আসার আগের দিন তাহির জামান প্রিয়র মেয়ে পদ্মপ্রিয় পারমিতা অনেক কান্না করেছে। কাঁদতে কাঁদতে সে বলছিল, 'আমি আমার প্রিয় বাবার কাছে যাব। প্রিয় বাবাকে নিয়ে আসব। প্রিয় বাবা আমাকে আর ঘাড়ে নেয় না।'

শামসী আরা জামান বলেন, মেয়েটি সবাইকে বলে তার প্রিয় বাবা মারা গেছে। কিন্তু মাঝেমধ্যে সে নিজেই বুঝতে চায় না যে বাবা আর নেই। এ সময় ছেলে ও নাতির কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

সাংবাদিক তাহির জামান প্রিয় নিহতের ঘটনায় নিউমার্কেট থানায় মামলা করেছেন মা শামসী আরা জামান। ২০ আগস্ট মধ্যরাতে প্রায় ১২ ঘণ্টা থানায় অপেক্ষার পর এ মামলা দা?য়ের করেন তিনি। মামলার আসামিরা হলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, পুলিশের সাবেক আইজি চৌধুরী আব্দুল্লাহ-আল-মামুন, রমনা বিভাগের সাবেক ডিসি মোহাম্মদ আশরাফ ইমাম, নিউমার্কেট জোনের এডিসি হাফিজ আল-আসাদ, নিউমার্কেট জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. রেফাতুল ইসলাম রিফাত, নিউমার্কেট থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আমিনুল ইসলাম, ঘটনাস্থলে দায়িত্বরত অজ্ঞাতনামা ৩০/৪০ জন পুলিশ এবং বিজিবির কর্মকর্তা ও সদস্যরা।

> গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের হিসাবে ২২১ জন সাংবাদিক হতাহত হয়েছেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আরও ৯৮ জন আহত সাংবাদিকের তথ্য পায়। এছাড়া সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের কাছেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাংবাদিক আহতের খবর আসে। আহত সাংবাদিকদের মধ্যে অন্তত একশ সাংবাদিকের আঘাত গুরুতর। অনেকে প্রায় পঙ্গু হতে চলেছেন। এখনো হাসপাতালে কাতরাচ্ছেন অনেক

মামলা করতে গিয়ে ভোগান্তির বিষয়ে প্রিয়র মা বলেন, বেলা ১১টা থেকে রাত ১২টার পর পর্যন্ত নিউমার্কেট থানায় অবস্থান করেছি। পুলিশ শুরু থেকেই গড়িমসি করছিল, যাতে মামলাটা না নেওয়া যায়।

মামলার এজাহারে বলা হয়, 'তাহির জামান প্রিয় ১৯ জুলাই দুপুর ৪টায় নিউমার্কেটের সায়েন্স ল্যাবরেটরি সীমানাসংলগ্ন ল্যাবএইড সেন্ট্রাল রোড এলাকায় ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থলে আসে। এ সময় ছাত্র-জনতা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলাকালে তাদের উদ্দেশ্য করে প্রাণঘাতী বুলেট ছুড়তে থাকে পুলিশ। ওই সময় আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছিলেন এবং তারা কোনো প্রকার স্লোগান, মিছিল বা চিল্লাচিল্লি করেনি।

সেই সময় মিরপুর রোড ধরে নিউমার্কেট জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. রেফাতুল ইসলাম রিফাত, নিউমার্কেট থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে দায়িত্বরত অজ্ঞাতনামা আসামিরা এগিয়ে যাচ্ছিলেন। উল্লিখিত রমনা বিভাগের সাবেক ডিসি মোহাম্মদ আশরাফ ইমামের নির্দেশে পুলিশের একটি গ্রুপ ল্যাবএইডের দুই বিল্ডিং-এর মাঝের রাস্তায় ঢুকে পড়ে। ছাত্র-জনতা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ৩০ থেকে ৪০ জনের পুলিশবাহিনীর একটি গ্রুপ দ্রুত পেছন থেকে গ্রিন রোডের মুখে চলে আসে। আমার ছেলেসহ অসংখ্য ছাত্র-জনতা সেন্ট্রাল রোডের মাথায় শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছিলেন। সবাই পুলিশবাহিনীর আক্রমণের মুখে পড়ে যান এবং সাক্ষীরাসহ সবাই হঠাৎ প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পান।'

এজাহারে আরও বলা হয়, 'সাক্ষী তানভীর আরাফাত ধ্রুব আত্মরক্ষার্থে ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় ১০-১২ ফুট দূরত্বে কমলা রঙের শার্ট ও কালচে রঙের প্যান্ট পরিহিত একজনের (আমার ছেলে মো. তাহির জামান প্রিয়) নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁর মাথার পেছন থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসতে দেখে এবং আমার ছেলের মৃতদেহটি নিউমার্কেট থানার অধীন সায়েন্স ল্যাবের প্রাচীরসংলগ্ন রাস্তার মুখে লুটিয়ে পড়ে ছিল। অজ্ঞাতনামা ৪-৬ জন আন্দোলনকারী ছাত্র সাদা কাপড় উঁচু করে আমার ছেলের মৃতদেহ ল্যাবএইড হাসপাতালে নেওয়ার উদ্দেশে আইডিয়াল কলেজ রাস্তা দিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। কিন্তু অজ্ঞাতনামা আসামিরা অনবরত গুলি ছুড়তে থাকায় আন্দোলনরত ছাত্ররা আমার ছেলের মৃতদেহ ল্যাবএইড হাসপাতালে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হওয়ায় ল্যাবএইডের সামনের রাস্তায় রেখে দ্রুত আইডিয়াল কলেজমুখী সেন্ট্রাল রোডের ভেতর ঢুকে পড়েন।'

এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, 'একপর্যায়ে ৪-৬ জন অজ্ঞাতনামা আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা আমার ছেলের হাত-পা ধরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। আমার ছেলের মৃতদেহ নিয়ে সামনে এগিয়ে আসে। কিন্তু অজ্ঞাতনামা পুলিশবাহিনী এবং বিজিবি বারবার গুলি ছোড়ায় সাক্ষীরা-সহ অন্যরা আমার ছেলেকে আর হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেনি। কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, উল্লিখিত আসামিদের নির্দেশে আমার ছেলের লাশ নিয়ে অজ্ঞাতনামা আসামিরা অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে চলে যায়। পরবর্তী সময়ে সৈয়দা ফারিয়া উলফাৎসহ অন্যরা আমাকে ফোন করে উল্লিখিত ঘটনার বিষয়ে জানান এবং আমার ছেলের মৃত্যুর খবর দেন। আমার ছেলের সন্ধান পাওয়ার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতাল-সহ বিভিন্ন মেডিক্যালে খোঁজাখুঁজি করার জন্য আমি ছেলের বন্ধুদের অনুরোধ করি। একপর্যায়ে ২০ জুলাই রা?তে খবর পেয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে গেলে বেশ কয়েকটা লাশ দেখালে আমার ছেলের বন্ধু মো. তাহির জামান প্রিয়র পরনের কাপড় এবং মুখ দেখে লাশ শনাক্ত করেন।

প্রদীপ কুমার ভৌমিকের মৃত্যু

৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের আগের দিন (৪ আগস্ট) দুপুরের পর সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে উপজেলা প্রেস ক্লাবে হামলার ঘটনা ঘটে। সেখানে অবস্থানরত সাংবাদিক প্রদীপ কুমারকে পিটিয়ে আহত করেন হামলাকারীরা। হাসপাতালে নেওয়ার পর প্রদীপ কুমারের মৃত্যু হয়। তিনি দৈনিক খবরপত্রের রায়গঞ্জ প্রতিনিধি ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, হামলাকারীরা ধারালো রামদা দিয়ে নৃশংসভাবে প্রদীপ কুমারকে হত্যা করে। গণ-অভ্যুত্থানের দিন বেলা সাড়ে ১২টায় সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলা সদরে পত্রিকার জন্য লেখালেখি করার সময় প্রেস ক্লাবে ঢুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ডাক্তার প্রদীপ কুমার ভৌমিককে নিষ্ঠুরভাবে কুপিয়ে হত্যা করে। প্রদীপ প্রেস ক্লাবের নির্বাচিত সহ-সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া ক্ষেতমজুর আন্দোলনেরও নেতা ছিলেন।

প্রদীপ কুমার ভৌমিক সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার নলকা ইউনিয়নের বিষ্ণুপুর গ্রামে ১৯৬৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা দিলীপ কুমার ভৌমিক। মা কমলা রানী ভৌমিক। প্রদীপ কুমার ভৌমিকরা ছয় ভাইবোন ছিলেন। তিন ভাই ও তিন বোন। ভাইদের মধ্যে প্রদীপ ছিলেন দ্বিতীয়। তিনি ছিলেন একজন নিম্নবিত্ত কৃষকের সন্তান। আশির দশকে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে আন্দোলন গড়ে তুলেন। সেই সময় তিনি ছিলেন স্কুলের ছাত্র। ছাত্র অবস্থায়ই গরিব মানুষের আন্দোলনের মিছিল-মিটিংয়ে যোগ দিতেন, তাঁদের লড়াইয়ে উৎসাহ দিতেন। পরে সাংবাদিকতায় জড়ান। চিকিৎসক হিসাবেও পরিচিতি ছিল তাঁর।

সাংবাদিক সোহেল আখঞ্জীর তিন শিশুসন্তান ও স্ত্রী অকূল দরিয়ায়

গণ-অভ্যুত্থানের দিন ৫ আগস্ট হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে নিহত হন সাংবাদিক সোহেল আখঞ্জী (২৭)। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ভয়াবহ সংঘর্ষের সময় ভিডিয়ো ধারণকালে হামলার শিকার হন স্থানীয় দৈনিক লোকালয় পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার সোহেল আখঞ্জী। সোহেল জেলার বানিয়াচং উপজেলার কমলারাণীর দিঘির পূর্বপাড়ে মোশাহিদ আখঞ্জীর ছেলে। আন্দোলনকারীদের মৃত্যুর খবর পেয়ে সোহেল বাড়ি থেকে বের হয়ে থানায় গিয়ে নিজেই লাশ হয়ে ফিরেন। অভিযোগ রয়েছে, হবিগঞ্জের সাবেক ডিসির সামনে সাংবাদিক আখঞ্জীসহ দুইজনের প্রাণহানি ঘটে। তিনি নির্বিকার ছিলেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ৫ আগস্ট বেলা ১১টায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সাগরদীঘির পশ্চিমপাড় ঈদগাহ মাঠ থেকে মিছিল বের করে। গ্যানিংগঞ্জ বাজার প্রদক্ষিণ শেষে মিছিলকারী ৪-৫ হাজার লোক বড়োবাজার শহিদ মিনারে গিয়ে জড়ো হন। পরে বিক্ষুব্ধ লোকজন মিছিল নিয়ে থানার সামনে গেলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। একপর্যায়ে সংঘর্ষ ভয়াবহ রূপ নেয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনার সময় পুলিশ রাবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাসের শেল, সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে। পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলে চারজনসহ সাতজন নিহত হন। সাংবাদিক সোহেল আখঞ্জী নিহতদের একজন। কেউ কেউ বলছেন, সংঘর্ষের ভিডিয়ো ধারণের সময় তাঁর ওপর হামলা হয়।

এতিম তিন শিশুসন্তান রেখে শহিদ হওয়া সোহেলের স্ত্রী মৌসুমী আক্তার মিডিয়ার সামনে স্বামী হারানোর বর্ণনা করে কান্নায় ভেঙে পড়েন। মৌসুমী জানান, স্বামী নিহত সোহেলের আপন বলতে এই পৃথিবীতে কেউই নেই। তাঁর মা, বাবা ও আপন ভাই-বোন বলতে কেউই নেই। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীকে হারিয়ে আখঞ্জির পরিবারের চুলোয় ঠিকমতো আগুনও জ্বলছে না এখন। ছোট্ট ছোট্ট

বাচ্চা নিয়ে নিদারুণ কষ্টে দিনপাত করছেন সোহেলপত্নী মৌসুমী। এতিম বাচ্চাদের দেখার জন্য এবং লেখাপড়ার জন্য সবার কাছে সহযোগিতা চান তিনি। সাংবাদিক সোহেল আখঞ্জির পরিবারের খোঁজ কেউ নিচ্ছেন না বলে অভিযোগ পরিবারের। নিহত সোহেলের অসহায় তিন এতিম শিশু বাচ্চাকে কীভাবে মানুষ করবেন বিধবা স্ত্রী মৌসুমী আক্তার, সে প্রশ্নের উত্তর মিলছে না।

সোহেল আখঞ্জী হত্যা মামলায় আসামি করা হয়েছে বানিয়াচং আজমিরীগঞ্জের আওয়ামী লীগের সাবেক দুই সংসদ সদস্য, বানিয়াচং উপজেলার সাবেক দুই উপজেলা চেয়ারম্যান, কয়েকজন ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের কয়েক নেতাকে। মামলার কোনো আসামিকে গ্রেফতার করার খবর পাওয়া যায়নি।

আহত তিন শতাধিক সংবাদকর্মী

জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের সংবাদ সংগ্রহকালে বিপুলসংখ্যক সাংবাদিক আহত হয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আহত সাংবাদিকের সংখ্যা তিন শর অধিক। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে নিহত ও আহত সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহ করে। জেলা পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের অধীন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় সারা দেশে হতাহত সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহ করে প্রধান কার্যালয়ে পাঠায়। এছাড়া বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টও সহায়তা দিতে জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানে হতাহতদের তথ্য আহ্বান করে। এতে দেখা যাচ্ছে, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের হিসাবে ২২১ জন সাংবাদিক হতাহত হয়েছেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আরও ৯৮ জন আহত সাংবাদিকের তথ্য পায়। এছাড়া সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের কাছেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাংবাদিক আহতের খবর আসে।

আহত সাংবাদিকদের মধ্যে অন্তত একশ সাংবাদিকের আঘাত গুরুতর। অনেকে প্রায় পঙ্গু হতে চলেছেন। এখনো হাসপাতালে কাতরাচ্ছেন অনেক।

ইমন পঙ্গুত্বের ঝুঁকিতে

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মারাত্মক জখম সাংবাদিক আমিনুল ইসলাম ইমন পঙ্গু হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসসের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা জানান।

উন্নত চিকিৎসা না হলে তিনি পঙ্গু হয়ে যেতে পারেন। পুলিশের গুলি তাঁর শরীর ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। অসংখ্য ছররা গুলি এখনো শরীরে। ৫৩ দিন ঢাকা মেডিক্যালে চিকিৎসা নিয়ে তিনি এখন বাসায় রয়েছেন। স্বাভাবিক হাঁটাচলা করতে পারেন না। স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে উন্নত চিকিৎসা প্রয়োজন বলে জানান ইমন। এখন তিনি স্বাভাবিক কাজ করতে পারবেন না। তাঁর পূর্ণ সুস্থতা ও পুনর্বাসনে সরকারের সংশ্লিষ্টদের সুদৃষ্টি কামনা করেন।

২০ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে মালিবাগ রেলগেট এলাকায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি অ্যাকশনের দৃশ্য ধারণ করতে গেলে গায়ে প্রেস লেখা সিকিউরিটি জ্যাকেট ও বুকে সাংবাদিকের পরিচয়ের আইডি কার্ড ঝুলানো থাকার পরও সরাসরি ইমনকে গুলি করে পুলিশ। একটি গুলি তাঁর শরীরের তলপেট ভেদ করে, আরেকটি দুপায়ের সংযোগস্থলের পাশ দিয়ে বের হয়ে যায়। তাছাড়া শরীরে বিদ্ধ হয় অসংখ্য ছররা গুলি।

পুলিশ মৃত ভেবে তাঁর দেহকে রাস্তার পাশে ফেলে রাখে। একপর্যায়ে স্থানীয় কয়েকজন তাঁকে ঢাকা মেডিক্যালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন তাঁর প্রাণ রয়েছে। চিকিৎসকরা ঢাকা মেডিক্যালের জরুরি বিভাগের বিপরীতে বার্ন ইউনিটে তাঁকে স্থানান্তর করেন। চিকিৎসকদের চেষ্টায় ৪৮ ঘণ্টা পর তাঁর জ্ঞান ফেরে। ঢাকা মেডিক্যালের বার্ন ইউনিটে কয়েকদিন চিকিৎসার পর তাঁকে বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে শরীরে দুটি অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। সেখানে ২৮ দিন চিকিৎসা চলা অবস্থায় তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়। তাঁকে ঢাকা মেডিক্যালের সিসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। টানা ৫৩ দিন হাসপাতালে থেকে এখন বাসায় রয়েছেন তিনি। ইমনের শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে একাধিক বুলেটবিদ্ধ। তাছাড়া বিদ্ধ হয়েছে অসংখ্য ছররা গুলি। আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতজনদের কাছ থেকে ধার করে ইতোমধ্যে অনেক অর্থ তাঁরা খরচ করেছেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁদের কাছে নেই।

তীব্র যন্ত্রণা ভোগাচ্ছে জাবেদ হোসেনকে

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় দেহজুড়ে বিদ্ধ ১৬টি ছররা বুলেটের আঘাত সেরে উঠলেও ডান হাতে এখনো তীব্র যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছেন ঢাকা টাইমসের সাংবাদিক জাভেদ হোসেন। দুবার অস্ত্রোপচারের গভীর ক্ষত শুকিয়ে গেলেও হাতটি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে তাঁর। গুলিবিদ্ধ হওয়া সেই হাতের তীব্র ব্যথা জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। সেই ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে গাইবান্ধা শহরের এসকেএস হাসপাতালের ফিজিওথেরাপি সেন্টারে তিন সপ্তাহ ধরে নিয়মিত চিকিৎসা নিচ্ছেন তিনি। চিকিৎসকরা বলছেন, গুলিবিদ্ধ ডান হাত দিয়ে স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম করতে পারবেন কি না, তা এখনো অনিশ্চিত।

৪ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সমর্থনে গাইবান্ধার রাস্তায় নেমে আসে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা। পরিস্থিতি সহিংস হয়ে উঠলে তিন সাংবাদিকসহ দুই শতাধিক ছাত্র-জনতা আহত হন। পরে আহতদের উদ্ধার করে গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর মধ্যে তিন সাংবাদিককে ভর্তি করা হয় গাইবান্ধা শহরের এসকেএস হাসপাতালে। সেখানে ঢাকা পোস্টের সাংবাদিক রিপন আকন্দের শরীর থেকে দুটি, বার্তা বাজারের সাংবাদিক সুমন মিয়ার শরীর থেকে পাঁচটি এবং ঢাকা টাইমসের জাভেদ হোসেনের শরীর থেকে ১৪টি ছররা গুলি বের করা হয়। পরে এক্স-রে রিপোর্টে দেখা যায়, সাংবাদিক জাভেদের ডান হাতে আরও দুটি গুলি আছে। এর সপ্তাহখানেক পর অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সাংবাদিক জাভেদের ডান হাতের কবজি থেকে বাকি দুটি ছররা গুলি বের করা হয়।

অস্ত্রোপচারে গুলি অপসারণ হলেও ডান হাতের তীব্র ব্যথায় এখন পর্যন্ত জর্জরিত তিনি। ভারী কিছু তোলা তো দূরের কথা, মোটরসাইকেল চালাতেও কষ্ট হয় জাভেদের। বিশেষজ্ঞদের মতে, তাঁর ডান হাতের অবস্থা আশঙ্কাজনক, যা ভবিষ্যতে তাঁর সাংবাদিকতার ক্যারিয়ারে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ইমন ও জাবেদের মতো আহত সাংবাদিকদের অনেকেই আজীবন বয়ে বেড়াতে হবে কষ্ট। উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা না পেলে তাঁদের কষ্ট বহুগুণ বেড়ে যাবে।

ছাত্র-জনতার অবিস্মরণীয় এ গণ-অভ্যুত্থানের শহিদ ও অঙ্গ হারানো পরিবারগুলোর কষ্ট ও বেদনা আজ পুরো দেশের জনগণের কষ্টে পরিণত হয়েছে। তাঁদের স্বজনরা পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তিকে দেশের জন্য উৎসর্গ করেছেন। শত শত শহিদের রক্ত এই জমিনকে উর্বর করেছে। নতুন এই বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার এ বিপ্লবের প্রত্যেক শহিদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পাওয়ার অধিকার রাখে। আগামী দিনের বাংলাদেশ যেন এই শহিদদের স্বপ্নের আলোকে গড়ে তোলা হয়, সে প্রচেষ্টা থাকা চাই।

সিলমী সাদিয়া

দেওয়ালে দেওয়ালে জনরোষ, নাকি নতুন করে লেখা সংবিধান?

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে নতুন করে স্বাধীনতার স্বাদ পেল বাংলাদেশ। সব শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নিলেও তারুণ্যের অংশগ্রহণই মুখ্য ছিল। নির্ভয়ে বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়ে দেশকে স্বৈরাচারমুক্ত করেছে। দেশকে ঢেলে সাজাতে কী কী চায়, অর্থাৎ মুক্ত বাংলাদেশকে কোন জায়গায় দেখতে চায়, তা দেওয়ালে দেওয়ালে লিখতে শুরু করেছে 'জেন-জি'। রাজপথের ধারে, অলিগলির দেওয়ালে, স্কুল-কলেজের ফটকে, বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশে, শ্রেণিকক্ষে রংতুলির আঁচড়ে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে হাজারো ভাবনা এই অদম্য তরুণদের। এত গ্রাফিতি আর কখনো দেখেনি বাংলাদেশ।

আমার প্রাণের শহর খুলনায় যখন গ্রাফিতি আঁকি, তখনো আমি জানি না যে সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা এ জিনিসের আর্কাইভের গুরুদায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেব। গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার শিক্ষার্থী হিসাবে মুক্তগণমাধ্যম নিয়ে 'ফ্রি প্রেস' কনসেপ্ট নিয়ে এঁকেছি। এরপরই শুরু হয় এক বিভাগীয় শহর থেকে অন্য বিভাগীয় শহরে দৌড়ানো। বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজ, পুলিশ লাইনস, সরকারি-বেসরকারি অফিস থেকে শুরু করে শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে দেওয়াল গ্রাফিতির ছবি তুলে আর্কাইভ করি। এ লেখা নিয়ে বসতে গিয়ে ভাবলাম, দেখে আসি আমার দিন-রাত এক করে তোলা ছবিগুলো। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, ঠিকই খসে পড়তে শুরু করেছে দেওয়ালের আস্তর। গ্রাফিতির ছবি তুলে ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজে সংরক্ষণের চিন্তা এবং এর সার্থকতা এখানেই। নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগেই যেন এগুলো চিরদিনের জন্য অনলাইনে সংরক্ষণ করে রেখে দেওয়া যায়। এ চিন্তা থেকেই গ্রাফিতির ছবি তোলা শুরু। খুলনায় পিটিআই মোড়ে আমার গ্রাফিতিটি যেমন সৌন্দর্য হারাতে বসেছে, দেওয়ালের আস্তর খুলে 'ফ্রি প্রেস' লেখাটি এবং গণমাধ্যমের যত টুলস রয়েছে, তা মুছে যেতে শুরু করেছে; তেমনই সিলেটের এমসি কলেজের মূল ফটকের বাম পাশের দেওয়ালের বহু গ্রাফিতি এরই মধ্যে শ্যাওলা পড়ে মুছে যাওয়ার উপক্রম। গণ-অভ্যুত্থানের ভাষা ধরে রাখতে এ আর্কাইভের গুরুত্ব আলাদা করে বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

লেখক: যুগ্ম-আহ্বায়ক, বাংলাদেশ ফ্রি প্রেস ইনিশিয়েটিভ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ হলের গেটে লেখা গ্রাফিতি
ছবি: লেখকের তোলা

শহিদ আবু সাঈদের মায়ের যে আর্তনাদ 'হামার ব্যাটাকে মারলু কেনে?' সেই থেকেই ফ্যাসিবাদ সাম্রাজ্যের পতনের শুরু। রক্তর বিনিময়ে দেশ স্বৈরাচার-ফ্যাসিবাদমুক্ত হয়েছে। নতুন ইতিহাসের সাক্ষী হয়েছে বাংলাদেশ। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকে 'স্প্রে পেইন্ট' দিয়ে রাস্তায় ও দেওয়ালে লেখা অনেক কথা বছর ঘুরতে হারিয়ে যাবে। অনেকে মুছে ফেলতেও শুরু করেছে। রাজধানীর পাঁচতারকা হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ের সামনের সীমানা দেওয়ালে স্প্রে দিয়ে বিপ্লবীদের কিছু লেখা ছিল। এখন তা আর নেই। এরই মধ্যে নতুনভাবে রং করে ভদ্র সেজেছে অভিজাতদের হোটেলটি। ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল কেন হারিয়ে যাবে, নিজেকে এ প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে কোনো জবাব না পেয়ে কাজে নেমে পড়ি। জুলাই গ্রাফিতি ডটকমে (julygraffiti.com) আমরা শুধু গ্রাফিতিগুলোরই ছবি তুলে রাখছি, তা নয়। উদ্যোগটি মূলত জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সাংস্কৃতিক আর্কাইভ। এখানে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক গ্রাফিতি থাকলেও স্লোগান, কবিতা ও গান রয়েছে যথেষ্ট।

অভ্যুত্থান-পরবর্তী কয়েকটা দিন দেখেছি ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রাজশাহী, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুষ্টিয়াসহ দেশের প্রতিটি জেলায় আনাচে-কানাচে শিশু-কিশোর-যুবকরা দেওয়াললিখনে মনোযোগী হয়ে উঠেছে। ওই সময় আরেক দল ট্রাফিকব্যবস্থাসহ ভেঙে পড়া রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিল। কেউ কেউ ট্রাফিকের দায়িত্বও যেমন পালন করেছেন, গ্রাফিতিও লিখেছেন, আবার রাতে ডাকাত পাহারা দিয়ে দেশকে রেখেছেন নিরাপদ। দেশজুড়ে আঁকা গ্রাফিতিগুলোর বার্তা অনেক ক্ষেত্রেই মিল। যেমন: বেশির ভাগ জায়গায় প্রাসঙ্গিক চিত্র এঁকে তাতে লেখা হয়েছে বিভিন্ন বাক্য। দেশের আনাচে-কানাচে রয়েছে আবু সাঈদের দুহাত প্রসারিত করে পুলিশের বন্দুকের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ানো ছবিটি। আন্দোলনকারীদের পানি পান করাতে শহিদ মুগ্ধের যে আকুতি–'পানি লাগবে কারও, পানি?' মুগ্ধের ছবি এঁকে 'পানি লাগবে পানি' লেখা চিত্রের দেখা মিলছে দেশের সর্বত্র। তেমনই বহু জায়গায় লেখা আছে, 'স্বাধীনতা এনেছি, সংস্কারও আনব', '৩৬ জুলাই, বাংলাদেশ স্বাধীন', '৩৬ জুলাই ২০২৪, দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ', 'মেধার বিজয়', 'শোন মহাজন, আমরা অনেকজন', 'আমরা ইন্টারনেট বন্ধ করিনি, ইন্টারনেট একা একা বন্ধ হয়ে গেছে', 'স্যাটেলাইটে পানি ঢুকেছে', 'বিকল্প কে? আমি তুমি আমরা', 'বিকল্প কে? ছাত্রসমাজ', 'আমরাই বিকল্প', 'বল বীর বল উন্নত মম শির', 'কারার ঐ লৌহ কপাট', 'একাত্তর দেখিনি, বায়ান্ন দেখিনি, ২৪ দেখেছি', 'এবারের স্বাধীনতা সবার, পাহাড় কিংবা সমতলের', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'নেতারা বিক্রি হতে পারে, ছাত্র-জনতা কখনো বিক্রি হয় না', 'পুলিশ লীগ বাংলা ছাড়', 'ছিল তো অনেকে, কতজনরেই হারাইলাম'। দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি রেমিট্যান্সযোদ্ধাদেরও স্মরণ করা হয়েছে বহু গ্রাফিতিতে। প্রশাসনের প্রতি মানুষের মনোভাব ফুটে উঠেছে 'ঘুস চাইলে ঘুসি' লেখার মধ্য দিয়ে।

অন্যদিকে আন্দোলন চলাকালে স্প্রে দিয়ে লেখাগুলোর সংরক্ষণও জরুরি ছিল। যেমন: ঢাকার মিরপুর ১০ নম্বরের রাস্তায় স্প্রে করে কালো কালিতে লেখা 'আমরা হাসিনামুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ চাই', লাল কালিতে লেখা 'হাসিনা কসাইখানা' এবং লাল-সাদা রং দিয়ে সড়কে এঁকে লেখা 'ভারতীয় রাজাকার, বাংলা ছাড়, বাংলা ছাড়!' এগুলো ৩ আগস্টে লেখা, কয়েকদিন থাকলেও এখন তা হারিয়ে গেছে। একইভাবে নীল রঙের স্প্রে দিয়ে ৩ আগস্টের লেখা 'শরম নাই তোর, পদত্যাগ কর' লেখাটিও মুছে গেছে। এই মুছে যাওয়া একেবারে বৃষ্টি-ধুলায় হয়েছে তা নয়, কিছু গণবিরোধী লোক এসব মোছার কাজটি লুকিয়ে লুকিয়েও করে যাচ্ছে। রাজধানীর কারওয়ান বাজারে মেট্রো স্টেশনের নিচে এবং টিএসসি থেকে শাহবাগের পথে আগালে মেট্রোর পিলারে লেখা 'খুনি হাসিনা' কে বা কারা যেন সাদা রং দিয়ে মুছে দিয়েছে। শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদের দোসর যারা রয়ে গেছে, তাদের দ্বারাই এসব সাধিত হচ্ছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দ্বিতীয়বার দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সংবিধান সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছে নবগঠিত কমিশন। কিন্তু সংবিধানের মূলকথা লেখা হয়ে গেছে এরই মধ্যে। দেওয়ালে দেওয়ালে আঁকা গ্রাফিতিতেই ছাত্র-জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা উঠে এসেছে। সাবেক তথ্য ও

কুমিল্লা জিলা স্কুলের দেওয়াল থেকে নেওয়া
ছবি: লেখকের তোলা

সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, 'আমরা নতুন সংবিধানের কথা বলছি, সংবিধান তো বাংলাদেশের দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হয়ে গেছে। দেশের মানুষ কেমন বাংলাদেশ দেখতে চায়, তা গ্রাফিতির মাধ্যমে দেওয়ালে দেওয়ালে তুলে ধরেছেন তরুণেরা।' নাহিদ ইসলাম যথার্থই বলেছেন। দেশের ১০টি জেলায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। প্রতিটি জায়গায় দেখেছি ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা কোনো না কোনো দেওয়ালে আছেই। সব ধর্মের মানুষের ছবি এঁকে বা ধর্মীয় উপাসনালয়ের ছবি এঁকে দেশটাকে সবার বাংলাদেশ হিসাবে বলা হয়েছে।

গ্রাফিতি, গান, কবিতা ও স্লোগানের আর্কাইভের এই কাজে অনেক পরিশ্রম যাচ্ছে; কিন্তু দিনশেষে অত্যন্ত জরুরি একটি কাজ করার যে প্রশান্তি, তা অতুলনীয়। এমনও এক সপ্তাহ গেছে–খুলনা থেকে বুধবার ঢাকা গিয়ে বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহ শহর ও আশপাশের ক্যাম্পাসগুলোর ছবি তুলে ঢাকায় ফিরে শুক্রবার পান্থপথের পাঠশালায় নিজের ক্লাস করেছি দিনে আর রাতের বাসে রওয়ানা হয়েছি চট্টগ্রামে। শনিবার সারা দিন চট্টগ্রাম শহর আর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছবি তুলে রাতের গাড়িতে ঢাকা ফিরেছি এবং ঢাকায় নেমেই খুলনার বাস ধরে ঘরে ফিরেছি। এর মধ্যে প্রতিটি দিনই ১০ কিলোমিটারের বেশি হাঁটতে হয়েছে। ইতিহাসকে ধারণের এ চেষ্টায় বুঁদ হয়ে আছি, দেশকে যে নতুন করে সাজাতে হবে। পরিশেষে পুণ্যভূমি সিলেটের রাজপথের পাহারাদার হয়ে থাকা কোনো এক বিপ্লবীর লেখা গ্রাফিতির সুরে সুর মেলাতে মেলাতে শেষ করতে চাই–'চলো স্বাধীন এ দেশটারে বুকে বেঁধে রাখি।'

সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার দেওয়াল থেকে নেওয়া ছবি: লেখকের তোলা

দেওয়ান তাহমিদ

অপতথ্যের আগ্রাসন

৫ আগস্ট-পরবর্তী বাংলাদেশের কয়েকদিন

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট, বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনের অবসান হয়। তার পতনের পরপরই রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার এ সময়টিতে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অসংখ্য অ্যাকাউন্ট থেকে ছড়াতে থাকে নানাবিধ গুজব, ভুয়া সংবাদ ও অপতথ্য। এই অপতথ্য প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে শেখ হাসিনার দীর্ঘদিনের মিত্ররাষ্ট্র ভারতের গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীরা। শুধু বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বহির্বিশ্বে নেতিবাচক ধারণা দেওয়াই নয়, বরং অভ্যুত্থানের ফলে শেখ হাসিনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং হিন্দুত্ববাদী আদর্শের পতনের যে সম্ভাবনা বাংলাদেশে দেখা গেছে, তা প্রতিরোধ করার লড়াইয়ের অংশ হিসাবেও অপতথ্যগুলো ছড়ানো হয়। ফলে এ অপতথ্যগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং এর কেন্দ্রে ছিল সাম্প্রদায়িকতা সংক্রান্ত গুজব।

বাংলাদেশি গণমাধ্যম ও ফ্যাক্ট চেকিং প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এসব অপতথ্য বিশ্লেষণ ও ডিবাংক করে। *ডয়েচে ভেলে* তিনটি উল্লেখযোগ্য গুজব বিশ্লেষণ করে দেখায় কীভাবে তা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধিতে কাজ করছে।[১] *আলজাজিরা* ভারতীয় মিডিয়ার গুজবগুলোকে ইসলামফোবিক বা ইসলামবিদ্বেষী বলে চিহ্নিত করেছিল[২], এবং *দ্য ডিপ্লোম্যাট* সংখ্যালঘু নিপীড়নবিষয়ক অপতথ্যগুলোকে অন্তর্বর্তী সরকারকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা হিসাবে দেখায়।[৩] এবিষয়ক ভিডিয়োগুলো অতি ডানপন্থিরা শেয়ার করে প্রকৃত তথ্যকে আড়াল করছে মর্মে সংবাদ প্রকাশ করে *বিবিসি*।[৪] ভারতের স্বাধীন ফ্যাক্ট চেকারদের এবং কিছু ক্ষেত্রে তাদের গণমাধ্যমেও এসব গুজবের ফ্যাক্ট চেক করতে দেখে গেছে। ওই সময়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অপতথ্য নিয়ে এখানে আলোচনা করা হলো।

লেখক: এক্সিকিউটিভ, ফ্যাক্ট চেক অ্যান্ড মিডিয়া রিসার্চ টিম, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

লিটন দাসের বাড়িতে আগুন দাবি করে ভারতীয় মিডিয়ায় অপতথ্য

দাবি: হিন্দু ক্রিকেটার লিটন দাসের বাড়িতে আগুন

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে হিন্দুত্ববাদ নিয়ে কাজ করা 'হিন্দুত্ব নাইটস' নামে একটি পেজ মাশরাফির বাড়ি পোড়ানোকে লিটন দাসের বাড়ি বলে প্রচার করে।[৫] পেজটিতে মাশরাফির বাড়ি পোড়ানোর দৃশ্য এবং লিটন দাসের ছবি কোলাজ করে দিয়ে লিখেছে, 'বাংলাদেশি হিন্দু ক্রিকেটার লিটন দাসের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।' ৫ আগস্ট দেওয়া পোস্টটি দুইদিনেই 'ভিউ' হয়েছে ১৬ লাখেরও বেশি।

ফ্যাক্ট: ভাইরাল পোস্টটিতে লিটন দাসের ছবি দেওয়া হলেও যে বাড়িটি পোড়ার দৃশ্য দেখানো হয়েছে, সেটি ক্রিকেটার মাশরাফি বিন মুর্তজার। মাশরাফি আওয়ামী লীগের দুইবারের সংসদ সদস্য ছিলেন এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জায়গা থেকে তাঁর বাড়িতে আগুন লাগানো হয়। ডয়েচে ভেলে বাড়িটি জিওলোকেট করে নিশ্চিত করেছে যে এটি মাশরাফির।[৬] লিটন দাসও নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি পোস্টে লেখেন, 'সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন মিডিয়ায় একটি খবর প্রচারিত হয়েছে আমাদের বাড়িতে হামলার ঘটনা নিয়ে, যার কোনো সত্যতা নেই। কেউ এসব গুজবে কান দেবেন না। আমি এবং আমার পরিবার এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরাপদে রয়েছি।'[৭]

দাবি: হিন্দু নারীকে যৌন হয়রানি, সংঘবদ্ধ ধর্ষণ

হিন্দু নারীরা যৌন হয়রানি ও ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন মর্মে বিভিন্ন গুজব ছড়ানো হয়, যার মধ্যে একটি পোস্ট উল্লেখযোগ্যভাবে ছড়িয়ে

পড়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে ২ আগস্ট একটি ছবি পোস্ট করা হয়, যার ক্যাপশনে লেখা ছিল "জামায়াতে ইসলামীর কথিত কোটা আন্দোলনকারীরা একটি হিন্দু মেয়েকে গণধর্ষণের ভিডিও (টেলিগ্রামের) 'ইসলামিক আর্মি' গ্রুপে ফাঁস করেছে। তারা হুমকি দিয়েছে, হাসিনার সরকার পতন হলে তারা হিন্দু পরিবারের মেয়েদের ঘর থেকে বের করে এনে ধর্ষণ করবে।"[৮]

ফ্যাক্ট: ওই স্ক্রিনশটের রিভার্স ইমেজ সার্চে দেখা গেছে, এটি বিগত বছরগুলোয় ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার দাবিতে শেয়ার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩ সালে এটি ভারতের মণিপুর রাজ্যের একটি গ্যাং রেপের ঘটনায় ব্যবহার করা হয়, যেখানে দাবি করা হয়েছিল হিন্দু পুরুষরা এক খ্রিষ্টান মেয়েকে অপহরণ ও সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করেছে। আবার ২০২১ সালে এটি ইন্দোনেশিয়ায় ভাইরাল হয়। যেখানে বলা হয়েছিল, ইন্দোনেশীয় এক নারী অভিবাসী কর্মীকে পাঁচজন বাংলাদেশি নাগরিক নির্যাতন ও ধর্ষণ করেছে। ভারতের ফ্যাক্ট চেকিং প্ল্যাটফরম বুম ভিডিয়োটির উৎস খুঁজে বের করে জানায়, এটি ২০২১ সালের মে মাসে বেঙ্গালুরুর পূর্বাঞ্চলের রামামূর্তি নগরের ঘটনা। সেখানে ২২ বছর বয়সি এক তরুণীর ওপর নির্যাতন ও ধর্ষণের অভিযোগে তিন নারীসহ ১২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করে পুলিশ।[৯]

দাবি: চট্টগ্রামে নবগ্রহ মন্দিরে আগুন

ভাইরাল হওয়া বিভিন্ন ফেসবুক পোস্টে চট্টগ্রামের নবগ্রহ মন্দিরের ছবি জুড়ে দাবি করা হয়, এটিতে আগুন দিয়েছেন 'বাংলাদেশের ইসলামপন্থিরা'।

ফ্যাক্ট: বিবিসি ভেরিফাই অনুসন্ধান করে দেখিয়েছে, সহিংসতার সময় নবগ্রহ মন্দিরটি অক্ষত ছিল। প্রকৃতপক্ষে আগুন লেগেছিল মন্দিরের পাশেই থাকা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে। ঘটনার পর বিবিসির সংগ্রহ করা ছবিতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের পোস্টারের পোড়া ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। মন্দিরটির কর্মী স্বপন দাশ বিবিসি ভেরিফাইকে জানান, '৫ আগস্ট দুপুরের পর মন্দিরের পেছনে থাকা

আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে হামলা হয়। হামলাকারীরা ভেতর থেকে আসবাবপত্র বের করে এনে সেগুলোয় আগুন ধরিয়ে দেয়।'[১০]

দাবি: সাতক্ষীরায় মন্দিরে আগুন

ভারতের Zee News Madhya Pradesh-Chhattisgarh I News24-সহ একাধিক মিডিয়া ও এক্স অ্যাকাউন্টে সাতক্ষীরায় মন্দিরে আগুন দেওয়া হয়েছে দাবি করে খবর প্রকাশ করা হয়। দাউদাউ করে আগুনে জ্বলছে–এমন একটি ভবনের ভিডিয়ো শেয়ার করে ওই দাবিতে প্রচার করা হয়। News24 তাদের খবরে লেখে, 'মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, সাতক্ষীরা জেলার ইসকন মন্দিরসহ কয়েকটি হিন্দু মন্দিরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশটিতে হিন্দু সম্প্রদায়কে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে। হিন্দু মন্দির, বাড়ি ও দোকানে

লুটপাট চালানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তরা সামাজিক মাধ্যমে ভারত সরকার ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। এখন পর্যন্ত সহিংসতায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৪০ জনে দাঁড়িয়েছে এবং কিছু মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে বলেও খবর রয়েছে।'

ফ্যাক্ট: যে ভবনটি আগুনে পুড়তে দেখা যায়, সেটি কোনো মন্দিরের ভবন নয়, বরং সাতক্ষীরার কলারোয়ায় অবস্থিত 'রাজপ্রাসাদ অ্যান্ড

রিসোর্ট' নামে একটি রেস্টুরেন্ট। আজকের পত্রিকার সাতক্ষীরা প্রতিনিধির বরাতে জানা যায়, রেস্টুরেন্টটির মালিক কলারোয়া উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কাজী আসাদুজ্জামান শাহজাদা।[১১] অর্থাৎ এটি মন্দির নয় কিংবা কোনো হিন্দু ব্যক্তির মালিকানাধীন কোনো স্থাপনাও নয়।

দাবি: হিন্দু গায়ক রাহুল আনন্দের বাড়িতে আগুন

সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসাবশত বা হিন্দুদের ওপর আক্রমণের অংশ হিসাবে জলের গান ব্যান্ডের শিল্পী রাহুল আনন্দের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে–এমন দাবিতে ভারতের ইন্ডিয়া টুডে, এনডিটিভি, দ্য প্রিন্ট, অপ ইন্ডিয়া, জি নিউজ, টাইমস অব ইন্ডিয়াসহ বিভিন্ন গণমাধ্যম সংবাদ প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ, এনডিটিভি শিরোনাম করে 'ঢাকায় হিন্দু শিল্পী রাহুল আনন্দের বাড়িতে আগুন দিয়েছে মব'।[১২] এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশি কিছু গণমাধ্যমও ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক রং চড়িয়ে পরিবেশন করেছিল।

ফ্যাক্ট: বাস্তবতা হলো, রাহুল আনন্দের বাড়িতে কেউ আগুন দেয়নি, বরং ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে 'বঙ্গবন্ধু মিউজিয়াম'-এ আগুন দেওয়া হয় এবং রাহুল আনন্দের বাড়িটি মিউজিয়ামসংলগ্ন হওয়ায় সেখানেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পর রাহুল আনন্দের সহধর্মিণী ঊর্মিলা শুক্লা একটি ফেসবুক পোস্টে লেখেন, 'তারা কেউ নির্দিষ্ট করে আমাদের বাড়ি পুড়াতে চায়নি...চেয়েছে ৩২-এর এই বাড়িগুলো ধ্বংস করতে।' ফ্যাশন হাউজ খুঁতের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ফারহানা হামিদ এক পোস্টে লিখেছেন, 'রাহুলদার বাসায় আগুনের সঙ্গে তাঁর ধর্ম, বর্ণ, জাত, সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক নেই। এমন গুজব না ছড়ানোর অনুরোধ করছি।' পোস্টটি 'জলের গানের' (রাহুল আনন্দের ব্যান্ড) অফিশিয়াল পেজ থেকে শেয়ার করে লেখা হয়েছে, 'প্লিজ, লেখাটা পড়ুন ও সত্যটা জানুন।' অর্থাৎ রাহুল আনন্দের বাড়িতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আগুন দেওয়া হয়নি, তাঁর ধর্মপরিচয়ের সঙ্গেও বাড়িতে আগুন লাগার ন্যূনতম সম্পর্ক নেই।

দাবি: হিন্দুদের ওপর গণহত্যা ও মব হত্যাকাণ্ড

টাইমস গ্রুপের মালিকানাধীন মিরর নাউ-এর ইউটিউব চ্যানেলে 'বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলা? গণহত্যা, মব হত্যাকাণ্ড'

শিরোনামে প্রকাশিত একটি ভিডিয়োতে চারটি বাড়িতে সহিংসতা ও অগ্নিসংযোগের দৃশ্য দেখানো হয়। এতে '২৪ জনকে পুড়িয়ে হত্যা'র একটি দাবিও দেখা যায়।[১৩]

ফ্যাক্ট: আলজাজিরা স্বাধীনভাবে যাচাই করে জানায়, ভিডিয়োতে দেখানো চারটি বাড়ির মধ্যে দুটির মালিকই মুসলিমদের বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। শেখ হাসিনার পতনের পর ৮ আগস্ট পর্যন্ত দুইজন হিন্দু ব্যক্তি নিহত হয়েছেন, যাদের একজন পুলিশ এবং অন্যজন আওয়ামী লীগ কর্মী ছিলেন।[১৪] ২৪ জনকে পুড়িয়ে হত্যার যে দাবি করা হয়েছে, সেটিও বিভ্রান্তিকর। কারণ, যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন চাকলাদারের মালিকানাধীন পাঁচতারকা হোটেল জাবির ইন্টারন্যাশনালে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ২৪ জন মারা গেলেও সেটির সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোনো যোগসূত্র নেই।

দাবি: ধর্মান্তরিত হতে জোর করা

২০২৪ সালের ১২ আগস্ট ভারতের একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ভিডিয়ো পোস্টের ক্যাপশনে লেখা ছিল, 'বাংলাদেশের

ভিডিও। হিন্দু নারী কাঁদছেন, কারণ তাঁদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অথবা বাংলাদেশ ছাড়তে চূড়ান্ত আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে।' এক্স ও থ্রেডসের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোয়ও অনুরূপ দাবিতে ক্লিপটি ছড়িয়ে পড়ে।

ফ্যাক্ট: এএফপি ফ্যাক্ট চেক দেখিয়েছে, যে ভিডিয়োটি শেয়ার করা হয়েছিল, তা পুরোনো এবং বাংলাদেশি অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধনের। বাঁধন আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীদের প্রতি সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দিয়েছিলেন, ভিডিয়োটি সেই সময়কার।[১৫] মূল ভিডিয়োটি বাঁধন ৩ আগস্টেই তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করেছিলেন।[১৬]

দাবি: দেবী দুর্গার প্রতিমা ভাঙা

ফেসবুকের বিভিন্ন পোস্টে 'বিজয় উল্লাসটা মন্দির, প্রতিমা ভেঙেই

শুরু করলেন? এটাই তাহলে বিজয়?' এমন ক্যাপশনে দেবী দুর্গার মস্তকহীন একটি ছবি প্রচার করা হয়। পোস্টগুলোয় #SaveBangladeshiHindus-এর মতো হ্যাশট্যাগ যুক্ত করা হয়।

ফ্যাক্ট: দৈনিক আজকের পত্রিকার ফ্যাক্ট চেক ডেস্ক রিভার্স ইমেজ অনুসন্ধান করে জানায়, ছবিটি ২০২২ সালের ৩১ জানুয়ারিতে

প্রকাশিত 'দুর্গাপূজাকালীন সহিংসতার বিচার বিভাগীয় তদন্ত স্থগিতের নির্দেশ সুপ্রিমকোর্টের'—এমন শিরোনামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে পাওয়া যায়। ফ্যাক্ট চেক প্ল্যাটফরম বুমও ছবিটি পুরোনো বলে নিশ্চিত করে।[১৭]

৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার আগ পর্যন্ত তিনদিন বাংলাদেশে কার্যত কোনো সরকার ছিল না। পুলিশও কর্মক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকায় ফিরতে দেরি করেছে। এ অনিশ্চয়তার সময় ছাত্র-জনতা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, মন্দির পাহারা, বাড়িঘর ও নিজ নিজ এলাকা পাহারা দেওয়ার কাজ যেমন করেছে, তেমনই নানান অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ঘটনাও ঘটেছে। এ অনিশ্চিত সময়ে ভারতের গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন অনেক অপতথ্য ছড়ানো হয়েছে, যা বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না এবং অতিরঞ্জিত ছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন ফ্যাক্ট চেক প্ল্যাটফরম, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম, এমনকি ভারতের কিছু ফ্যাক্ট চেক প্ল্যাটফরম এসব অপতথ্য যাচাই করতে কাজ করেছে। তবে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি নিয়ে এসব অপতথ্যের নেতিবাচক প্রভাব পুরোপুরি মোকাবিলা করা সম্ভব হয়নি।

তথ্যসূত্র

১. Fact Check: False Claims Fuel Ethnic Tensions in Bangladesh. *Deutsche Welle* (August 7, 2024), https://archive.ph/MM9pj
২. 'Islamophobic, alarmist': How some India outlets covered Bangladesh crisis, *Al Jazeera* (August 8, 2024), https://archive.ph/fbWTF
৩. Nazneen Mohsina and Roshni Kapur, Disinformation About Attacks on Minorities Threaten Stabilization Efforts in Bangladesh, *The Diplomat* (August 26, 2024), https://archive.ph/lJOF5
৪. Jacqui Wakefield and Shruti Menon, The far-right videos distorting the truth of Bangladesh minority attacks, *BBC* (August 18, 2024), https://archive.ph/Rbc82
৫. https://ghostarchive.org/archive/5Jbf4
৬. Fact Check: False Claims Fuel Ethnic Tensions in Bangladesh. *Deutsche Welle* (August 7, 2024), https://archive.ph/MM9pj
৭. বাড়িতে হামলার খবর পুরোটাই গুজব, জানালেন লিটন, *প্রথম আলো* (৯ আগস্ট ২০২৪), https://archive.ph/Uo3zi
৮. https://archive.ph/6BDji
৯. Fact Check: False Claims Fuel Ethnic Tensions in Bangladesh. *Deutsche Welle* (August 7, 2024), https://archive.ph/MM9pj
১০. Jacqui Wakefield and Shruti Menon, The far-right videos distorting the truth of Bangladesh minority attacks, *BBC* (August 18, 2024), https://archive.ph/Rbc82
১১. বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের বাড়ি-দোকান-মন্দিরে হামলা, ছড়িয়েছে গুজবও, *আজকের পত্রিকা* (৭ আগস্ট ২০২৪), https://archive.ph/IssyJ
১২. Mob Sets Hindu Musician Rahul Ananda's House On Fire In Dhaka, *NDTV* (August 7, 2024), https://archive.ph/iRnty
১৩. https://www.youtube.com/watch?v=zQxcgBampvE
১৪. 'Islamophobic, alarmist': How some India outlets covered Bangladesh crisis, *Al Jazeera* (August 8, 2024), https://archive.ph/fbWTF
১৫. Muslim actress misidentified as 'Hindu woman' protesting against attacks in Bangladesh, *AFP Fact Check* (August 29, 2024), https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.36EH4FY
১৬. https://www.facebook.com/AzmeriHaqueBadhoon/videos/370952309439876
১৭. বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলা বলে ছড়াল ভাঙা দুর্গা প্রতিমার পুরোনো ছবি, বুম (৬ আগস্ট ২০২৪), https://archive.ph/AXOJ3

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে ২২ মার্চ তাঁর কার্যালয়ে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন জমাদানের সময় কমিশনপ্রধান কামাল আহমেদসহ অন্যরা ছবি: পিআইডি

প্রধান উপদেষ্টার কাছে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন জমা

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন ২২ মার্চ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। এ সময় কমিশনপ্রধান কামাল আহমেদসহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'সংস্কার প্রস্তাবের মধ্যে যেগুলো এখনই বাস্তবায়ন করা সম্ভব, সেগুলো আমরা দ্রুত বাস্তবায়ন করে ফেলতে চাই।

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কামাল আহমেদের নেতৃত্বাধীন গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের এই কাজকে অমূল্য হিসাবে অভিহিত করে এই প্রতিবেদন যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য মানুষ পড়তে পারে, সে লক্ষ্যে কাজ করার পরামর্শ দেন তিনি।

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলোর মধ্যে সাংবাদিকদের ন্যূনতম বেতন বিসিএস নবম গ্রেডের সমতুল্য, যোগ্যতা হবে স্নাতক এবং সাংবাদিকদের জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করা, সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত যোগাযোগে অনুপ্রবেশ, নজরদারি ও আড়ি পাতার ঘটনাগুলো তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা, সাংবাদিকতায় 'স্বাধীনতার জন্য আইন, সংস্কার ও সাংবাদিকতা সুরক্ষা আইন' প্রণয়ন, অনলাইন পোর্টালে সংবাদ বুলেটিন সম্প্রচার নিষেধাজ্ঞা বাতিলের সুপারিশ উল্লেখযোগ্য।

গত বছরের ১৮ নভেম্বর জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কামাল আহমেদকে প্রধান করে 'গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন' গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. গীতিআরা নাসরীন, দ্য ফিন্যানশিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক ও সম্পাদক পরিষদের প্রতিনিধি শামসুল হক জাহিদ, অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন ওনার্স (অ্যাটকো) প্রতিনিধি, নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (নোয়াব) সচিব আখতার হোসেন খান, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আবদাল আহমেদ, যমুনা টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টারের ট্রাস্টি ফাহিম আহমেদ, মিডিয়া সাপোর্ট নেটওয়ার্কের আহ্বায়ক সাংবাদিক জিমি আমির, ডেইলি স্টারের বগুড়া জেলা প্রতিনিধি মোস্তফা সবুজ, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের ডেপুটি এডিটর টিটু দত্ত গুপ্ত এবং শিক্ষার্থী প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ আল মামুন। (সূত্র: কালের কণ্ঠ, ২২ মার্চ (অনলাইন) ও সমকাল, ২৩ মার্চ ২০২৫)

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিলেন উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম

অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নতুন উপদেষ্টা হলেন মো. মাহফুজ আলম। ২৬ মার্চ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

মন্ত্রিপরিষদের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের দায়িত্ব পুনর্বণ্টন করেছেন। এতে উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন।

মো. মাহফুজ আলম ২০২৪ সালের ১০ নভেম্বর উপদেষ্টা হিসাবে শপথ নেন। এর আগে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ২০ দিনের মাথায় ২৮ আগস্ট প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হিসাবে তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে স্নাতক করেছেন মো. মাহফুজ আলম। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্ল্যাটফরমের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগীর দায়িত্বে ছিলেন।

তারুণ্যের উৎসবে ৭৫ লাখ তরুণের অংশগ্রহণ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' শীর্ষক মাসব্যাপী আয়োজনের দুইদিনব্যাপী সমাপনী অনুষ্ঠান ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে তরুণদের সৃষ্টিশীলতায় উজ্জীবিত করার জন্য মাসব্যাপী এ আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম। তিনি আলোকচিত্র প্রদর্শনী, গ্রাফিতি ও ভিডিয়ো প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মাহবুবা ফারজানার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম এবং শহিদ সাকিলের মা বিবি আয়েশা।

দ্বিতীয় দিন ড্রোন ভিডিয়ো, আলোকচিত্র, চলচ্চিত্র ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম।

মাসব্যাপী চলা এ অনুষ্ঠানে সারা দেশের ৪৯৫টি উপজেলা ও ৬৪টি জেলার প্রায় ৭৫ লাখ তরুণ অংশ নেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব মাহবুবা ফারজানা

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অতিরিক্ত সচিব মাহবুবা ফারজানাকে পদোন্নতি দিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। ২৩ অক্টোবর মাহবুবা ফারজানাকে সচিব পদে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। ত্রয়োদশ বিসিএসে প্রশাসন ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত হন মাহবুবা ফারজানা। জন্মস্থান ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার স্বদেশি গ্রামে। তিনি পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক উপপরিচালক মরহুম মো. শামসুল ইসলাম সিদ্দিকীর মেয়ে।

মাহবুবা ফারজানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়াও পাবলিক পলিসি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। মাহবুবা ফারজানার স্বামী অধ্যাপক ড. নাজমুল আমীনও বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সদস্য। (সূত্র: ২৪ অক্টোবর ২০২৪, দৈনিক কালবেলা)

বাসস প্রধান হলেন মাহবুব মোর্শেদ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান সম্পাদক পদে সাংবাদিক মাহবুব মোর্শেদকে দুই বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শেখ শফিকুল ইসলাম প্রধান উপদেষ্টার প্রটোকল অফিসার-২ পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন। (সূত্র: ১৮ আগস্ট ২০২৪, সমকাল)

বিটিভির নতুন ডিজি মাহবুবুল আলম

বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) মহাপরিচালক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন মো. মাহবুবুল আলম। ২২ সেপ্টেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, মো. মাহবুবুল আলমকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে কর্মসম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী দুই বছর মেয়াদে বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) মহাপরিচালক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হলো। (সূত্র: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক)

কালের কণ্ঠের সম্পাদক হাসান হাফিজ

কালের কণ্ঠের সম্পাদক হলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের বর্তমান সভাপতি, বিশিষ্ট কবি ও দেশের প্রথিতযশা সাংবাদিক হাসান হাফিজ। ২৭ আগস্ট তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিকটির সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দীর্ঘ সাংবাদিকজীবনে তিনি দৈনিক জনকণ্ঠ, বৈশাখী টিভি, দৈনিক আমার দেশ, পাক্ষিক অনন্যা, হ্যাপিনেস টিভি ও কলকাতার সাপ্তাহিক দেশ-এ কাজ করেছেন। সর্বশেষ তিনি দৈনিক খবরের কাগজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এর আগে তিনি দৈনিক আমাদের নতুন সময় পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। (সূত্র: ২৮ আগস্ট ২০২৪, কালের কণ্ঠ)

১০০ উদীয়মান প্রভাবশালী

টাইম সাময়িকীর তালিকায় নাহিদ ইসলাম

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী টাইম ম্যাগাজিনের ২০২৪ সালের 'টাইম-১০০ নেক্সট ২০২৪' তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলামের নাম। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ছিলেন তিনি; যে আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয় এবং পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২ অক্টোবর প্রকাশ করা তালিকায় এসেছে মো. নাহিদ ইসলামের নাম। মো. নাহিদ ইসলাম সম্পর্কে টাইম ম্যাগাজিন বলেছে, বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের একজনকে ক্ষমতা থেকে নামাতে নাহিদ ইসলামকে ২৬ বছরের বেশি বয়সি হতে হয়নি। তিনি ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে অন্যতম, যাঁরা বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ শুরু করেছিলেন। বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার হাতে নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর জনমানুষের কাছে তাঁর পরিচিতি বেড়ে যায়। কিছুদিন পর তিনি ছাত্রদের পক্ষে এক দফা দাবি তুলে ধরেন: হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে। টাইম ম্যাগাজিন লিখেছে, বাংলাদেশে গত জুলাই-আগস্টের ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার মাধ্যমে পরিচিত হয়ে ওঠেন মো. নাহিদ ইসলাম। ওই সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হিসাবে গণ-অভ্যুত্থানে তিনি প্রধান ভূমিকা রাখেন।

বিশেষ করে ৩ আগস্ট জাতীয় শহিদ মিনারে লাখো জনতার সমাবেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের হয়ে এক দফা দাবি ঘোষণা করেন নাহিদ। আর সেই এক দফা দাবি ছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ওই সরকারের পদত্যাগ। নাহিদ ইসলাম টাইম ম্যাগাজিনকে বলেন, কেউ ভাবেনি যে তাঁকে পদচ্যুত করা সম্ভব হবে।

ওই আন্দোলনেই ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত হন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশ ছেড়ে তিনি ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এরপর থেকেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন নাহিদ।

সেনাবাহিনীর সমর্থনে তখন দেশ পরিচালনার জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ করেন ছাত্ররা। ছাত্রদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হন ৮৪ বছর বয়সি এই অর্থনীতিবিদ। এই সরকারে যোগ দেন নাহিদ ইসলামও। দায়িত্ব নেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের।

সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক নাহিদের বয়স ২৬ পেরোয়নি। এর মধ্যেই তিনি হয়ে গেছেন মহান এক সংগ্রামের নেতা। ২৪ সেপ্টেম্বর মো. নাহিদ ইসলামের সাক্ষাৎকার নেয় টাইম ম্যাগাজিন আর এতেই এসব তথ্য উঠে এসেছে।

'হাউ নাহিদ ইসলাম বিকেম এ ফেস অব বাংলাদেশ'স স্টুডেন্ট রেভ্যুলেশন' শিরোনামে ঐ সাক্ষাৎকারে টাইম ম্যাগাজিন নাহিদ সম্পর্কে লিখেছে, আন্দোলনের অনেক নেতার মধ্যে নাহিদ অন্যতম।

সাক্ষাৎকারে টাইম ম্যাগাজিনকে নাহিদ বলেছেন, 'কেউ ভাবতেও পারেনি শেখ হাসিনাকে উৎখাত করা সম্ভব হবে। কিন্তু তাই করে দেখিয়েছে মুক্তিকামী ছাত্র-জনতা।'

নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে নাহিদ বলেন, 'এখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ওপর মানুষের প্রত্যাশা আকাশচুম্বী। ১৫ বছরের কর্তৃত্ববাদী শাসনে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেভাবে ভেঙে পড়েছে, এখন তা মেরামতের চ্যালেঞ্জ নিতে হচ্ছে নতুন সরকারকে।'

নাহিদ আরও বলেন, 'আমাদের নতুন প্রজন্মের পালস বুঝতে হবে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহিংসতার যে পালাক্রম, এর অবসান ঘটাতে হবে। আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে।'

প্রসঙ্গত, প্রতিবছর বিশ্বের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের তালিকা প্রকাশ করে টাইম ম্যাগাজিন। (সূত্র: ৪ অক্টোবর ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক ও যুগান্তর)

গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে দাসসুলভ আচরণের সুযোগ নেই

——মো. নাহিদ ইসলাম

গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে দাসসুলভ আচরণের সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম। ৭ অক্টোবর জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'সংবাদমাধ্যমের সংস্কার: কেন? কীভাবে?' শীর্ষক মুক্ত আলোচনায় তিনি এসব কথা বলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা বলেন, যখন ওয়েজবোর্ডের কথা আসে, তখন সম্পাদক-মালিকরা এটি নিয়ে একধরনের বিরোধিতা করেন। বিভিন্ন সময়ে শোনা যায়, হাউজগুলোয় ঠিকমতো বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে বেতনের বিষয়টা আসলে সুরাহা হওয়া উচিত। সাংবাদিকতা যদি পেশা হয়, তাহলে পেশাদারি রক্ষা করতে হলে সেই মর্যাদাটা দিতে হবে। এখানে দাসসুলভ আচরণ করার কোনো সুযোগ নেই।

মুক্ত আলোচনায় অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ড. সাইফুল আলম চৌধুরী প্রমুখ। মিডিয়া সাপোর্ট নেটওয়ার্কের আয়োজনে অনুষ্ঠিত আলোচনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন সাংবাদিক জিমি আমির। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। (সূত্র: ৮ অক্টোবর ২০২৪, কালের কণ্ঠ)

সংস্কার ও নতুন রাষ্ট্র নির্মাণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত থেকে কাজ করতে চায় গণমাধ্যম

সম্পাদক পরিষদের সঙ্গে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বৈঠক

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের আশ্বস্ত করে সম্পাদক পরিষদের সভাপতি মাহফুজ আনাম জানিয়েছেন, সংস্কার ও নতুন রাষ্ট্র নির্মাণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত থেকে কাজ করতে চায় গণমাধ্যম। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অত্যন্ত জরুরি উল্লেখ করে সব ধরনের মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা বাতিলের আহ্বান জানান তিনি। মাহফুজ আনাম জানান, দেশের রূপান্তরমূলক এ যাত্রায় অংশীদার হতে চায় সম্পাদক পরিষদ।

২৯ আগস্ট দ্য ডেইলি স্টার সেন্টারে সম্পাদক পরিষদ ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে একটি মতবিনিময় সভায় সম্পাদক পরিষদের সভাপতি এ কথা বলেন। সভায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের লিয়াজোঁ কমিটি ও সমন্বয়ক কমিটির প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সভায় অন্তর্বর্তী কালীন সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম কীভাবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নামকরণ হলো, কীভাবে আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছিল, তা বিস্তারিত আলোচনা করেন। বাংলাদেশকে কেন্দ্রে রেখে কীভাবে একটি 'ইনক্লুসিভ সোসাইটি' করা যায়, সে লক্ষ্যে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা কাজ করছেন বলে জানান তিনি।

লিয়াজোঁ কমিটির সমন্বয়ক ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম বলেন, গণ-অভ্যুত্থান ছিল একটি সমন্বিত প্রয়াস। নব্বইয়ে যে একটি রাজনৈতিক বন্দোবস্ত হয়েছিল, তা ওয়ান-ইলেভেনে ভেঙে যায়। তখন থেকে জনমানুষের আকাঙ্ক্ষার জায়গা ধূলিসাৎ হয়েছে। ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ সাধনে এবার সব স্তর থেকেই লড়াই হয়েছে বলে জানান তিনি।

সভায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের লিয়াজোঁ কমিটি থেকে নাসীরউদ্দীন পাটওয়ারী (নাসির আব্দুল্লাহ), আকরাম হুসাইন, ভূঁইয়া আসাদুজ্জামান, মামুন আব্দুল্লাহিল ও আরিফুল ইসলাম আদীব; সমন্বয়কদের মধ্যে সারজিস আলম, হাসনাত আবদুল্লাহ এবং নাগরিক কমিটি থেকে সামান্তা শারমীন উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও বণিক বার্তা সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদের সঞ্চালনায় আলোচনাসভায় ছিলেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, যুগান্তর সম্পাদক সাইফুল আলম, নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীর, ঢাকা ট্রিবিউন সম্পাদক জাফর সোবহান, সংবাদ সম্পাদক আলতামাশ কবির, দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস সম্পাদক শামসুল হক জাহিদ, প্রতিদিনের বাংলাদেশ সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি, দেশ রূপান্তর সম্পাদক মোস্তফা মামুন, সংবাদের নির্বাহী সম্পাদক শাহরিয়ার করিম প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও ডেইলি স্টার সম্পাদক ও প্রকাশক মাহফুজ আনাম। (সূত্র: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক)

নোয়াবের সঙ্গে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময়

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কামাল আহমেদ বলেছেন, গণমাধ্যমসংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিয়ো এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালের রাজনৈতিক প্রভাব-মুক্ত হয়ে জনগণের স্বার্থে কাজ করতে হবে। ১০ ডিসেম্বর রাজধানীর সার্কিট হাউজ রোডের তথ্য ভবনে নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব)-এর সভাপতি এবং সদস্যদের সঙ্গে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের এক মতবিনিময় সভায় কমিশনপ্রধান এ কথা বলেন।

কামাল আহমেদ বিগত আন্দোলনে সংবাদমাধ্যমের ব্যর্থতা ও বিতর্কিত ভূমিকার কারণে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, এর পটভূমিতে গণমাধ্যমকে কীভাবে জনগণের স্বার্থে কাজে লাগানো যায়, সে বিষয়ে মতামত প্রদানের আহ্বান জানান। ডেইলি স্টার প্রকাশক মাহফুজ আনাম বলেন, গণমাধ্যমের আইনগত কাঠামো ও পরিবেশ সবকিছু মিলে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পরিবেশ আমাদের নেই। প্রথম আলোর প্রকাশক মতিউর রহমান বলেন, বিগত ১৫ বছর ও এর আগের সরকার সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে। অতীতের কোনো সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে পারেনি এবং সাংবাদিকরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেননি। (সূত্র: ১১ ডিসেম্বর ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক)

বাসসের চেয়ারম্যান সাংবাদিক আনোয়ার আলদীন

দৈনিক ইত্তেফাকের যুগ্মসম্পাদক আনোয়ার আলদীন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা-বাসসের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন। ১০ নভেম্বর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বাসসের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন অনুযায়ী তিন বছর মেয়াদে পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হলো। (সূত্র: ১১ নভেম্বর ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক)

ওয়াশিংটনে প্রেস মিনিস্টার সাংবাদিক গোলাম মোর্তোজা

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে প্রেস মিনিস্টার পদে নিয়োগ পেয়েছেন সাংবাদিক গোলাম মোর্তোজা। ১৯ নভেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। তাঁকে সচিব পদমর্যাদায় দুই বছরের জন্য এ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। (সূত্র: ২০ নভেম্বর ২০২৪, প্রথম আলো)

জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে কেক কাটছেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম

ফ্যাসিবাদের দোসরদের গণমাধ্যম থেকে বিতাড়িত করতে হবে

জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিতে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা

গণমাধ্যম থেকে ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিতাড়িত করার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, 'স্বৈরাচারের দোসররা এখনো দেশে-বিদেশে নানা ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত চালাচ্ছে। তারা নানাভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে। গণমাধ্যমেও ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচারের দোসররা রয়েছে।

২০ অক্টোবর রাতে জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ২০ অক্টোবর জাতীয় প্রেস ক্লাবের ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ভিডিয়ো প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। (সূত্র: ২১ অক্টোবর ২০২৪, কালের কণ্ঠ)

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের এমডি এম আবদুল্লাহ

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এবং সাংবাদিক সংগঠনের দীর্ঘদিনের নেতা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (এম আবদুল্লাহ)। ১৮ সেপ্টেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে কর্মসম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী দুই বছর মেয়াদে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে মুহাম্মদ আবদুল্লাহকে নিয়োগ দেওয়া হলো। উল্লেখ্য, জাতীয় প্রেস ক্লাব ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) স্থায়ী সদস্য এম আবদুল্লাহ বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতিসহ সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। দৈনিক আমার দেশ, ইনকিলাব-সহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। (সূত্র: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক)

গণমাধ্যমকে ফ্যাসিবাদের দালালমুক্ত করতে হবে: মাহমুদুর রহমান

আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান বলেছেন, গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশ ফ্যাসিবাদমুক্ত হলেও শেখ হাসিনা সরকারের চিহ্নিত দালালরা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। তারা বিভিন্ন গণমাধ্যমে বহাল তবিয়তে থেকে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

২২ অক্টোবর জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) যৌথ উদ্যোগে গণমাধ্যমের স্বাধীনতাবিরোধী কালাকানুন বাতিল এবং ফ্যাসিবাদমুক্ত গণমাধ্যমের দাবিতে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাহমুদুর রহমান এ কথা বলেন।

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী বলেন, আজ ফ্যাসিস্টমুক্ত দেশে দাঁড়িয়ে কথা বলছি; কিন্তু ফ্যাসিস্টদের ঝরানো রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি। শেখ হাসিনার আমলে সাগর-রুনিসহ অসংখ্য সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমগুলোর মালিকদের প্রতি আহ্বান জানাই, অবিলম্বে ফ্যাসিস্ট সরকারের দালাল সাংবাদিকদের অপসারণ করুন, নতুবা আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের শহিদদের রক্তের সঙ্গে বেইমানি করা হবে।

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন বিএফইউজের সভাপতি ওবায়দুর রহমান শাহীন, ডিইউজের সাধারণ সম্পাদক খুরশীদ আলম, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. শাহনেওয়াজ প্রমুখ। (সূত্র: ২৩ অক্টোবর ২০২৪, সমকাল)

ডিআরইউ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান করছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল

ডিআরইউ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ডে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক মাহমুদুল হাসান। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতাই ছিল না, তবু ডক্টরেট ডিগ্রি পান বেনজীর' শিরোনামে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য তিনি এ পুরস্কার পান। পুরস্কার প্রদান করেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।

৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় ঢাকা ক্লাবের স্যামসন এইচ চৌধুরী মিলনায়তনে 'প্রিন্ট মিডিয়া' ক্যাটাগরিতে মাহমুদুল হাসানের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন ডেইলি স্টারের আহসান হাবিব রাসেল এবং যৌথভাবে তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের ফারহান ফেরদৌস ও জসিম উদ্দিন হারুন।

টেলিভিশন মিডিয়া ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার ডিবিসি নিউজের আদিত্য আরাফাত, দ্বিতীয় পুরস্কার নিউজ টাইম বিডির মাসুদ মোস্তাহিদ এবং তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন চ্যানেল ৭১-এর পারভেজ নাদির রেজা।

অনলাইন মিডিয়া ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার জাগো নিউজের ইয়াসির আরাফাত, দ্বিতীয় পুরস্কার ঢাকা পোস্টের আরাফাত জুবায়ের এবং তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন জাগো নিউজের তৌহিদুজ্জামান তন্ময়। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিবেদন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন সমকালের আবু সালেহ রনি। (সূত্র: ৯ নভেম্বর ২০২৪, প্রথম আলো)

সাংবাদিক সাইফুলের পরিবারের পাশে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা

দীর্ঘদিন রোগে ভুগে ২৪ অক্টোবর মারা গেছেন পঞ্চগড়ের নির্ভীক কলমযোদ্ধা সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম বাবু। আগের দিন 'পঞ্চগড়ের সাংবাদিক সাইফুল মৃত্যুশয্যায়' শিরোনামে সমকালে সংবাদ প্রকাশ হয়। সেদিনই তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলামের নির্দেশে দুই লাখ টাকা সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। দু-একদিনের মধ্যে চেক প্রস্তুত হলেও সাইফুল ইসলামকে বাঁচানো যায়নি।

পঞ্চগড় প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বাবু ভোরের কাগজ, দৈনিক কালের কণ্ঠ, যায়যায়দিন, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, দিগন্ত টিভিসহ দেশের প্রথম সারির গণমাধ্যমে জেলা প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছেন। সৎ ও পরিশ্রমী সাইফুল ইসলাম দীর্ঘদিন কিডনি, ডায়াবেটিসসহ নানা জটিল রোগে ভুগছিলেন। (সূত্র: ২৯ অক্টোবর ২০২৪, সমকাল)

অবজারভারে শত বছরের বেশি সময় পর নারী সম্পাদক

শত বছরের বেশি সময় পর নারী সম্পাদক পেল যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদপত্র দি অবজারভার। পত্রিকাটির ছাপা সংস্করণে সম্পাদক হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন লুসি রক। কয়েকদিন আগেই অবজারভার কিনে নেয় টরটয়েজ মিডিয়া নামের একটি অনলাইন সংবাদমাধ্যম। এরপর পত্রিকাটির সম্পাদক পদে এই পরিবর্তন আনা হলো। (সূত্র: ২১ ডিসেম্বর ২০২৪, প্রথম আলো)

প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব সাংবাদিক আবুল কালাম আজাদ

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের উপ-প্রেস সচিব হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সিনিয়র সাংবাদিক মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদকে। ২২ অক্টোবর তাঁকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। সাংবাদিক মহলে তিনি আজাদ মজুমদার হিসাবে পরিচিত। আবুল কালাম আজাদ সর্বশেষ ইংরেজি দৈনিক নিউ এজের যুগ্ম-বার্তাসম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। (সূত্র: ২৪ আগস্ট ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক)

প্রধান উপদেষ্টার জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ

প্রধান উপদেষ্টার সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন সাংবাদিক ফয়েজ আহম্মদ। তাঁকে চুক্তিতে এ নিয়োগ দিয়ে ৫ ডিসেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। (সূত্র: ৬ ডিসেম্বর ২০২৪, সমকাল)

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি সালেহ, সাধারণ সম্পাদক সোহেল

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে ২০২৫ সালের জন্য সভাপতি পদে আবুল সালেহ আকন ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন মাইনুল হাসান সোহেল। নির্বাচনের জন্য গঠিত পাঁচ সদস্যের নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন এমএ আজিজ। অন্য সদস্যরা হলেন আবু তাহের, এলাহী নেওয়াজ, বাকের হোসেন ও শহিদুল ইসলাম। (সূত্র: ১ ডিসেম্বর ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক)

বিপিজেএ সভাপতি হারুন জামিল সাধারণ সম্পাদক লিখো

বাংলাদেশ পার্লামেন্ট জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিপিজেএ)-এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ঢাকা মেইলের হারুন জামিল এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন বাংলাদেশ পোস্টের শওকত আলী খান লিখো। ১১ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে সংগঠনের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে সভাপতি ও কার্যনির্বাহী সদস্য পদে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য পদে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। (সূত্র: ১২ জানুয়ারি ২০২৫, দৈনিক ইত্তেফাক)

ইআরএফ-প্রাণ মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেলেন ১০ সাংবাদিক

কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাত নিয়ে সংবাদ প্রতিবেদনের জন্য ইআরএফ-প্রাণ মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড-২০২৪ পেয়েছেন বিভিন্ন গণমাধ্যমের ১০ সাংবাদিক। অর্থনীতি বিটের সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) এবং দেশের কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাতের বৃহৎ শিল্পগ্রুপ প্রাণ যৌথভাবে এ পুরস্কার দিয়েছে। বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ১০ ডিসেম্বর রাজধানীর পল্টনে ইআরএফ কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

প্রিন্ট ক্যাটাগরিতে যৌথভাবে প্রথম হয়েছেন আমাদের সময়ের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জিয়াদুল ইসলাম ও সময়ের আলোর বাণিজ্য সম্পাদক আলমগীর হোসেন। এ শ্রেণিতে যৌথভাবে দ্বিতীয় হয়েছেন দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের দুই বিশেষ প্রতিনিধি জসিম উদ্দিন ও এফএইচএম হুমায়ূন কবির। তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন কালের কণ্ঠের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক সাহানোয়ার সাইদ।

অনলাইন ক্যাটাগরিতে প্রথম হয়েছেন জাগোনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের প্রধান প্রতিবেদক ইব্রাহিম হোসেন এবং দ্বিতীয় হয়েছেন যুগান্তরের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মিজানুর রহমান চৌধুরী। এছাড়া টেলিভিশন ক্যাটাগরিতে প্রথম হয়েছেন যমুনা টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তৌহিদ হোসেন এবং যৌথভাবে দ্বিতীয় হয়েছেন একুশে টিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তৌহিদুর রহমান ও ইনডিপেনডেন্ট টিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হরিপদ সাহা। (সূত্র: ১১ ডিসেম্বর ২০২৪, প্রথম আলো)

প্রবীণ সাংবাদিক ফোরামের কমিটি গঠন

রাজধানীর নয়াপল্টনে সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয়ে ১০ নভেম্বর আহ্বায়ক কমিটির সভায় বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার বাংলা বিভাগের সাবেক বার্তাপ্রধান আমিরুল মোমেনীন সভাপতি, দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক শিফট ইনচার্জ কায়কোবাদ মিলন কার্যকরী সভাপতি এবং দৈনিক স্বাধীনমতের প্রধান প্রতিবেদক মনিরুল ইসলাম মানিককে মহাসচিব করে সিনিয়র জার্নালিস্ট ফোরাম, বাংলাদেশ (প্রবীণ সাংবাদিক ফোরাম, বাংলাদেশ)-এর ৩১ সদস্যের তিন বছর মেয়াদি নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। (সূত্র: ১৩ নভেম্বর ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক)

ইআরএফ-এর সভাপতি মালা সাধারণ সম্পাদক কাশেম

অর্থনৈতিক বিটের সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ইংরেজি দৈনিক দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি দৌলত আকতার মালা। সাধারণ সম্পাদক পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন আরেক ইংরেজি দৈনিক দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের বিশেষ প্রতিনিধি আবুল কাশেম। ২৭ ডিসেম্বর রাজধানীর পুরানা পল্টনে ইআরএফ-এর নিজস্ব কার্যালয়ে সংগঠনের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা এবং ২০২৫-২৬ মেয়াদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। (সূত্র: ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪, সমকাল)

ডিকাব সভাপতি মঈনুদ্দিন সাধারণ সম্পাদক মামুন

কূটনৈতিক প্রতিবেদকদের সংগঠন ডিপ্লোমেটিক করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ডিকাব)-এর ২০২৫ সালের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ইউএনবির বিশেষ প্রতিনিধি একেএম মঈনুদ্দিন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক আমাদের সময়ের কূটনৈতিক প্রতিবেদক মো. আরিফুজ্জামান মামুন। ৩১ ডিসেম্বর ঢাকায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন শেষে ২০২৫ সালের জন্য নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির ঘোষণা দেওয়া হয়। (সূত্র: ১ জানুয়ারি ২০২৫, কালের কণ্ঠ)

লন্ডন-দিল্লির নতুন প্রেস মিনিস্টার আকবর-ফয়সাল

যুক্তরাজ্যের লন্ডন ও ভারতের নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে প্রেস মিনিস্টার নিয়োগ দিয়েছে সরকার। সাংবাদিক আকবর হোসেন মজুমদারকে লন্ডন এবং সাংবাদিক ফয়সাল মাহমুদকে নয়াদিল্লিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ২৪ নভেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে পৃথক প্রজ্ঞাপনে এ কথা জানানো হয়। আগামী দুই বছরের জন্য তাদের প্রেস মিনিস্টার পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হলো। (সূত্র: ২৫ নভেম্বর ২০২৪, সমকাল)

বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) সেরা প্রতিবেদনের পুরস্কার দিচ্ছেন স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন উপদেষ্টা হাসান আরিফ

ক্র্যাব সেরা প্রতিবেদন পুরস্কার পেলেন প্রথম আলোর মাহমুদুল হাসান

বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) সেরা প্রতিবেদন পুরস্কার পেয়েছেন প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক মাহমুদুল হাসান। ঢাকার অপরাধজগৎ ও শীর্ষ সন্ত্রাসীদের নিয়ে তিন পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের জন্য তিনি এ পুরস্কার পান। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন উপদেষ্টা হাসান আরিফ ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় রাজধানীর তোপখানা সড়কে বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) ভবন মিলনায়তনে তাঁর হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন। 'অপরাধবিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন' ক্যাটাগরিতে তিনি এ পুরস্কার পান। এছাড়া অপরাধবিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন (টেলিভিশন/রেডিয়ো) ক্যাটাগরিতে ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের নাজমুল সাঈদ এবং মাদক বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের (প্রিন্ট/অনলাইন) জন্য ঢাকা পোস্টের জসীম উদ্দীন বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। (সূত্র: ২৬ অক্টোবর ২০২৪, প্রথম আলো)

র‍্যাকের সভাপতি আলাউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক তাবারুল

রিপোর্টার্স অ্যাগেইনস্ট করাপশনের (র‍্যাক) কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে দৈনিক কালবেলার বিশেষ প্রতিনিধি আলাউদ্দিন আরিফ সভাপতি এবং অনলাইন পোর্টাল সকাল-সন্ধ্যার সিনিয়র রিপোর্টার তাবারুল হক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। (সূত্র: ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক)

হেলাল হাফিজ ও এরশাদ মজুমদার বেঁচে থাকবেন তাঁদের লেখায়

স্মরণসভায় বক্তারা

কবি হেলাল হাফিজ ও এরশাদ মজুমদার অনন্য মানুষ ছিলেন। তাঁদের চিন্তার প্রখরতা ও দূরদর্শিতা ছিল অতুলনীয়। এরকম মানুষ পাওয়া এ যুগে দুর্লভ। তাঁরা আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন তাঁদের লেখনীর মধ্য দিয়ে। ১৯ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আবিষ্কার প্রকাশনীর উদ্যোগে আয়োজিত সদ্য প্রয়াত কবি হেলাল হাফিজ ও এরশাদ মজুমদারের স্মরণসভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও কালের কণ্ঠের সম্পাদক কবি হাসান হাফিজের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন কবি ও সাংবাদিক সোহরাব হাসান, জাতীয় কবিতা পরিষদের আহ্বায়ক মোহন রায়হান, বৈষম্যবিরোধী সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সভাপতি সাঈদ বারী, এরশাদ মজুমদারের ছেলে ড. আসাদ জামিল, হেলাল হাফিজের বন্ধু ফাতেমা বেগম, হায়দার আহমেদ খান প্রমুখ। কবিতা পাঠ করেন হালিম আজাদ ও জুনান নাশিদ। (সূত্র: ২০ ডিসেম্বর ২০২৪, সমকাল)

১৬ সাংবাদিক পেলেন ব্র্যাকের অভিবাসন পুরস্কার

অভিবাসন খাতে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের মাইগ্রেশন মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ১৬ জন সাংবাদিক। ১৫ ডিসেম্বর রাজধানীর ডেইলি স্টার ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে দ্য ডেইলি স্টার সম্পাদক ও প্রকাশক মাহফুজ আনাম বলেন, অভিবাসীরা প্রতিবছর দেশে ২২ থেকে ২৩ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। সরকারের উচিত এই খাতে বিনিয়োগে জোর দেওয়া এবং প্রবাসীদের কল্যাণ নিশ্চিত করা। (সূত্র: ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪, প্রথম আলো)

জাতীয় প্রেস ক্লাবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে পরিবর্তন

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত ও শাহনাজ সিদ্দিকীকে ক্লাব ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁদের সদস্যপদও বাতিল করা হয়েছে। এ বিষয়ে ১১ আগস্ট জাতীয় প্রেস ক্লাবের এক নোটিশে বলা হয়, ছাত্র গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা ১০ আগস্ট জাতীয় প্রেস ক্লাবে এসে তাঁদের দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি ব্যবস্থাপনা কমিটি বরাবর পেশ করেন। তাঁদের দাবির যৌক্তিকতা বিবেচনা করে জাতীয় প্রেস ক্লাব ও সদস্যদের নিরাপত্তা এবং সাংবাদিক সমাজের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে ওই তিনজনকে অব্যাহতি ও সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছে। অন্যদিকে ক্লাবের সিনিয়র সহসভাপতি হাসান হাফিজকে সভাপতি এবং যুগ্মসম্পাদক আইয়ুব ভূঁইয়াকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ১১ আগস্ট ক্লাব ব্যবস্থাপনা কমিটির এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন হাসান হাফিজ। (সূত্র: ১২ আগস্ট ২০২৪, প্রথম আলো)

নতুন বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতের আহ্বান

টিআইবির অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) আয়োজিত দুর্নীতিবিরোধী অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার ২০২৪ ঘোষণা এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা (আইজে) কনক্লেভ উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্যানেল আলোচনায় প্রত্যাশার পাশাপাশি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতের আহ্বান জানান আলোচকরা। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন শুরু করল টিআইবি।

'দুর্নীতিবিরোধী অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার-২০২৪' ঘোষণার আগে দুটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। 'নতুন বাংলাদেশ: কেমন গণমাধ্যম চাই?' শীর্ষক প্যানেল আলোচনার শুরুতে টিআইবির আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর মাসুম বিল্লাহ গণমাধ্যম সংস্কারের জন্য টিআইবির সুপারিশ উপস্থাপন করেন। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামানের সঞ্চালনায় এ প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ, সিনিয়র সাংবাদিক ও গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কামাল আহমেদ, নিউ এজের সম্পাদক নূরুল কবীর এবং প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "এটা সত্য যে, গণমাধ্যমের ওপর চাপ এখনো আছে। তবে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো যদি জনস্বার্থ, জনকল্যাণকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করতে না পারে, তাহলে এ পরিস্থিতির পরিবর্তন কখনোই হবে না। গণমাধ্যমের শীর্ষ নেতৃত্বকে সম্পাদকীয় নীতিমালা অক্ষুণ্ন রেখে কাজ করতে হবে, রাজনৈতিক পট পরিবর্তন সেখানে যেন কোনো প্রভাব না ফেলে। আমরা দেখছি, বর্তমানে সাংবাদিকতার মান বেড়েছে। তাই আমরা 'নতুন বাংলাদেশে' সাংবাদিকতার ইতিবাচক সম্ভাবনার দিকে তাকাতে চাই, আমরা আশা হারাতে চাই না।"

নিউ এজের সম্পাদক নূরুল কবীর বলেন, 'গণমাধ্যমকে রাজনৈতিক ইতিহাস, সামাজিক ন্যায্যতার হিসাবে সমতা রাখতে হবে। একদিকে ভয় এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক দলের আনুকূল্যপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা সেল্‌ফ-সেন্সরশিপের দিকে নিয়ে যায়। এমন পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করতে হবে।' পিআইবির মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ বলেন, 'অপতথ্য-ভুলতথ্য মোকাবিলার দায়িত্ব গণমাধ্যমেরই। সঠিক তথ্য-উপাত্ত, বিশ্লেষণের প্রবাহ নিশ্চিতের মাধ্যমে আমাদের তা করতে হবে।'

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম বলেন, 'বিগত সরকারের সময়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।'

এ বছর বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে তিনজন সাংবাদিক এবং একটি প্রামাণ্য অনুষ্ঠানকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। আঞ্চলিক সংবাদপত্র বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন চট্টগ্রামের 'একুশে পত্রিকা ডটকম'-এর প্রধান প্রতিবেদক শরীফুল ইসলাম (শরীফুল রুকন)। জাতীয় সংবাদপত্র বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন 'দ্য ডেইলি স্টার'-এর সিনিয়র প্রতিবেদক জায়মা ইসলাম, টেলিভিশন প্রতিবেদন বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন যমুনা টেলিভিশনের সিনিয়র প্রতিবেদক আল-আমিন হক অহন। টেলিভিশন (প্রামাণ্য অনুষ্ঠান) বিভাগে বিজয়ী হয়েছে ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের প্রামাণ্য অনুষ্ঠান তালাশ।' (সূত্র: ৬ ডিসেম্বর ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক)

সাংবাদিকদের ওপর হামলায় সম্পাদক পরিষদের নিন্দা

শিক্ষার্থীদের কোটা আন্দোলনের সংবাদ সংগ্রহে নিয়োজিত সাংবাদিকদের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়েছে সম্পাদক পরিষদ। ১৬ জুলাই পরিষদ সভাপতি মাহফুজ আনাম ও সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। (সূত্র: ১৭ জুলাই ২০২৪, সমকাল)

দেশ রূপান্তরের সম্পাদক কামাল উদ্দিন সবুজ

দৈনিক দেশ রূপান্তরের নতুন সম্পাদক হয়েছেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কামাল উদ্দিন সবুজ। এ প্রসঙ্গে কামাল উদ্দিন সবুজ বলেন, 'আমার পেশাজীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিন আজ। কারণ, সাংবাদিকতাজীবনে সম্পাদক হিসাবে আমার যাত্রা শুরু হচ্ছে। এই দিনে সাংবাদিক হিসাবে আমি প্রয়াত অমিত হাবিবকে স্মরণ করছি। যিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে এই পত্রিকাকে শক্ত ভিত দিয়ে গেছেন। (সূত্র: ২ জানুয়ারি ২০২৪, কালের কণ্ঠ)

ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার পেলেন যাঁরা

২১তম ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার ২৬ অক্টোবর চ্যানেল আই স্টুডিওতে প্রদান করা হয়। চলচ্চিত্র পরিচালক গিয়াস উদ্দিন সেলিম ও চলচ্চিত্র সাংবাদিক আলাউদ্দীন মাজিদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক মতিউর রহমান চৌধুরী, রন্ধনবিদ কেকা ফেরদৌসী, অভিনেতা আফজাল হোসেন, প্রযোজক হাবিবুর রহমান খানসহ অনেকে। সূত্র ২৬ অক্টোবর ২০২৪, কালের কণ্ঠ

দিগন্ত টিভির সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

দিগন্ত টিভির সম্প্রচারে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। ৮ আগস্ট মন্ত্রণালয় এক আদেশে এ তথ্য জানিয়েছে। ২০১৩ সালের ৫ মে হেফাজতে ইসলামের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিদ্বেষ, গুজব ছড়ানো ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অভিযোগে চ্যানেলটির সম্প্রচার সাময়িক বন্ধ করে দিয়েছিল সরকার। (সূত্র: ৯ আগস্ট ২০২৪, কালের কণ্ঠ)

ডিআরইউ সাহিত্য পুরস্কার পেলেন কবি হাসান হাফিজ

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) সাহিত্য পুরস্কার-২০২৪ পেয়েছেন কালের কণ্ঠের সম্পাদক কবি হাসান হাফিজ। কবিতা/ছড়া ক্যাটাগরিতে তিনি এই পুরস্কার পান। এছাড়া মননশীল (প্রবন্ধ ও গবেষণা) ক্যাটাগরিতে কালবেলার জাকির হোসেন এবং কথাসাহিত্যে (গল্প/উপন্যাস) বাংলাদেশ প্রতিদিনের আহমেদ আল আমীন এ পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়া লেখক সম্মাননা পেয়েছেন আরও ২২ জন সাংবাদিক। ২৭ নভেম্বর ডিআরইউতে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি মানবজমিনের সম্পাদক ও কথাসাহিত্যিক মাহবুবা চৌধুরী। সাহিত্য পুরস্কার বিজয়ীদের নগদ টাকা, ক্রেস্ট ও সনদ এবং সম্মাননাপ্রাপ্তদের ক্রেস্ট ও সনদ দেওয়া হয়। (সূত্র: ২৮ নভেম্বর ২০২৪, কালের কণ্ঠ)

গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ সাংবাদিকদের পরিবারের মধ্যে আর্থিক অনুদান বিতরণ করছেন ওয়াশিংটন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারী

গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ সাংবাদিক পরিবারকে আর্থিক অনুদান

বিপ্লব ব্যর্থ করতে নানামুখী ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত চলছে বলে মনে করেন ওয়াশিংটনভিত্তিক অধিকার সংস্থা রাইট টু ফ্রিডমের নির্বাহী পরিচালক সাংবাদিক মুশফিকুল ফজল আনসারী। তিনি বলেছেন, জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের পর নানা ঘটনা ঘটছে। এতে স্পষ্ট–পালিয়ে যাওয়া স্বৈরাচারের দোসররা এখনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এ বিষয়ে সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে। ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় সাংবাদিকদেরও দায়িত্ব পালন করতে হবে। ২২ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনাসভা ও আর্থিক অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মুশফিকুল ফজল আনসারী। 'স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের পতনে সাংবাদিকসমাজের ভূমিকা ও বর্তমানে করণীয়' শীর্ষক এ সভা হয়। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও কালের কণ্ঠের সম্পাদক কবি হাসান হাফিজের সভাপতিত্বে যুক্তরাষ্ট্রের 'লাভ শেয়ার বিডি-ইউএস' আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণ-অভ্যুত্থানের সময় পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে শহিদ সাংবাদিক হাসান মেহেদী, তাহির জামান প্রিয় ও মো. শাকিল হোসেনের পরিবারের সদস্যদের হাতে অনুদানের অর্থ তুলে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের মহাপরিচালক এম আবদুল্লাহ বলেন, এই অভ্যুত্থানে পাঁচজন সাংবাদিক নিহত এবং ২২৬ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ৩৫ জন গুলিবিদ্ধ। আর গত সাড়ে ১৫ বছরে আরও ৫৪ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। (সূত্র: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, কালের কণ্ঠ)

মেক্সিকোতে দুই সাংবাদিককে হত্যা

মেক্সিকোর পশ্চিমাঞ্চলীয় দুটি প্রদেশে গুলি করে দুই সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। ৩০ অক্টোবর কোলিমা প্রদেশে হত্যা করা হয় প্যাট্রিসিয়া রামিরেজ নামের এক নারী সাংবাদিককে। এর আগের দিন রাতে মিচোয়াকান প্রদেশে হত্যা করা হয় একটি অনলাইন পোর্টালের সাংবাদিক মাওরিসিও ক্রুজকে। সাংবাদিকদের সহিংসতার শিকার হওয়ার দিক থেকে মেক্সিকো অন্যতম। (সূত্র: ১ নভেম্বর ২০২৪, প্রথম আলো)

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের নতুন সভাপতি রচি, সম্পাদক মশিউর

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের (২০২৫-২৬) নতুন কমিটির সভাপতি শওকত ওসমান রচি ও সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মজুমদার। ৯ ডিসেম্বর জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে প্রেস ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভায় কণ্ঠভোটে তারা নির্বাচিত হন। রচি বাংলা খবর ডট নিউজের সম্পাদক এবং মশিউর খবর সম্পাদক। ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়

পেশাজীবী সাংবাদিকদের এ সংগঠন 'আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব'। (সূত্র: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক)

খুলে দেওয়া হলো দৈনিক দিনকাল

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া দৈনিক দিনকাল খুলে দেওয়া হলো। ১১ আগস্ট বিএনপির একমাত্র সংবাদপত্র দৈনিক দিনকালের প্রকাশনার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ের প্রকাশনা ও ছাপাখানার এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, দৈনিক দিনকালের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাসের আবেদন বিবেচনায় ২০২২ সালের ২৬ ডিসেম্বর বাতিল-আদেশ স্থগিত করে পত্রিকাটি স্থায়ীভাবে প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হলো।

দৈনিক সংগ্রামের মিডিয়া তালিকাভুক্তি পুনর্বহাল : ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকা ২০২০ সালে সরকারি মিডিয়া তালিকাভুক্তি বাতিল করে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার। ১১ আগস্ট চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মিডিয়া তালিকায় দৈনিক সংগ্রাম পুনর্বহাল করা হয়েছে। (সূত্র: ১২ আগস্ট ২০২৪, দৈনিক ইত্তেফাক)

দুলাল মাহমুদ পেলেন এআইপিএস পুরস্কার

ক্রীড়া সাংবাদিকদের জন্য 'লিজেন্ড অব এআইপিএস অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত হয়েছেন পাক্ষিক ক্রীড়াজগত পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদ হোসেন খান দুলাল। এবার এআইপিএস এশিয়া এ অঞ্চলের ৬ জন ক্রীড়া সাংবাদিককে পুরস্কার দিয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়াও এবার এই পুরস্কার জিতেছেন সৌদি আরব, ভারত, নেপাল, মালয়েশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের পাঁচ সাংবাদিক।

১৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় নেপালের কাঠমান্ডুতে এআইপিএস এশিয়ার কংগ্রেসে ছয়জনকে তাঁদের সাংবাদিকতা ক্যারিয়ারে বিশেষ অবদানের জন্য এ পুরস্কার দেওয়া হয়। (সূত্র: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, প্রথম আলো)

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে যে সাংবাদিকদের হারিয়েছি

হাসান মেহেদী

(জন্ম: ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, মৃত্যু: ১৮ জুলাই ২০২৪)

কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন সাংবাদিক হাসান মেহেদী (৩৫)। তিনি অনলাইন নিউজ পোর্টাল ঢাকা টাইমসের স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। ১৮ জুলাই বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের ওপর এ ঘটনা ঘটে। সকাল থেকে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় সংবাদ সংগ্রহ করছিলেন মেহেদী। একপর্যায়ে তিনি পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষের খবর পেয়ে যাত্রাবাড়ী এলাকায় যান। সেখানে আরও কয়েকজন সাংবাদিক ছিলেন। তাঁরা ফ্লাইওভারের ওপর থেকে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন এবং ছবি তুলছিলেন। এর মধ্যে ছররা গুলি এসে মেহেদীর শরীরে লাগে। পরে সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে সন্ধ্যায় তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। মেহেদীর গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালীর বাউফলে।

মো. শাকিল হোসেন

(জন্ম: ৩ নভেম্বর ২০০২, মৃত্যু: ১৮ জুলাই ২০২৪)

দৈনিক ভোরের আওয়াজ পত্রিকার গাজীপুরের গাছা থানা প্রতিনিধি মো. শাকিল হোসেন ১৮ জুলাই কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মারা যান। উত্তরা আজিমপুরে ভিডিয়ো ধারণ ও ছবি তুলতে গিয়ে শহিদ হন তিনি। তাঁর বাবার নাম মো. বেলায়েত হোসেন।

প্রদীপ কুমার ভৌমিক

(জন্ম: ২ ডিসেম্বর ১৯৭৯, মৃত্যু: ৪ আগস্ট ২০২৪)

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ প্রেস ক্লাবের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক খবরপত্রের সাংবাদিক প্রদীপ ভৌমিক (৫৫) ৪ আগস্ট প্রাণ হারান। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন।

আবু তাহের মো. তুরাব

(জন্ম: ১ জুলাই ১৯৯০, মৃত্যু: ১৯ জুলাই ২০২৪)

কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালে ১৯ জুলাই জুমার নামাজের পর নগরীর বন্দরবাজারে গুলিবিদ্ধ হন এটিএম তুরাব। নয়া দিগন্তের জেলা প্রতিনিধি ও স্থানীয় দৈনিক জালালাবাদের এই তরুণ রিপোর্টার গুলিবিদ্ধ হলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং পরে সোবহানীঘাট ইবনে সিনা হাসপাতালে নেওয়া হয়। ওইদিন সন্ধ্যায় মারা যান তিনি। তুরাবের ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক ও সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান শামসুল ইসলাম বলেন, 'নিহতের শরীরে ৯৮টি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। গুলিতে তার লিভার ও ফুসফুস আঘাতপ্রাপ্ত হয়। মাথায় ঢিলের আঘাতও ছিল। এ কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে।'

তাহির জামান প্রিয়

(জন্ম: ৭ মার্চ ১৯৯৭, মৃত্যু: ১৯ জুলাই ২০২৪)

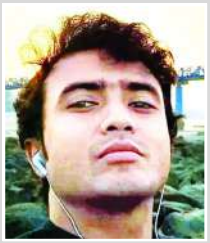

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে ১৯ জুলাই ধানমন্ডির সেন্ট্রাল রোডে সংঘর্ষ চলাকালীন নিহত হন দ্য রিপোর্ট ডট লাইভের ভিডিয়ো জার্নালিস্ট তাহির জামান প্রিয়। চিত্রকর্ম, ফটোগ্রাফিসহ সৃজনশীল কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পছন্দ করতেন প্রিয়। পাঠশালা-সাউথ এশিয়ান মিডিয়া ইনস্টিটিউট থেকে প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি (পেশাদার আলোকচিত্র) কোর্সের ওপর ডিপ্লোমা করেন তিনি। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে ফটো-জার্নালিস্ট হিসাবে যোগ দেন দ্য রিপোর্ট ডট লাইভে। তিনি ছিলেন স্বপ্নবাজ মানুষ। নিজ দেশ নিয়ে সিনেমা বানানোর খুব ইচ্ছা ছিল তাঁর। বাবা মো. আবু হেনা মোস্তফা জামান ও মা মোছা. শামছি আরা জামানের সংসারে নব্বইয়ের দশকে প্রিয়র জন্ম।

সোহেল আখঞ্জী

(জন্ম: ১৫ জানুয়ারি ১৯৮১, মৃত্যু: ৫ আগস্ট ২০২৪)

সাংবাদিক সোহেল আখঞ্জী ৫ আগস্ট হবিগঞ্জের পশ্চিমপাড় ইদগাহ মাঠ থেকে মিছিল নিয়ে থানার সামনে গেলে পুলিশের সঙ্গে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আন্দোলনকারীদের মধ্যে সংঘর্ষের ভিডিয়ো ধারণকালে তিনি গুলিতে মারা যান। তিনি সাগরদিঘীর পূর্বপাড়ের মৃত মোশাহিদ আখঞ্জীর ছেলে। তিনি স্থানীয় দৈনিক লোকালয় পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন।

শোক সংবাদ

অঞ্জনা রহমান

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনয়শিল্পী অঞ্জনা রহমান ৩ জানুয়ারি বিএসএমএমইউ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বেশ সুপরিচিত মুখ ছিলেন চিত্রনায়িকা অঞ্জনা। নৃত্যশিল্পী থেকে নায়িকা হয়ে সর্বাধিক যৌথ প্রযোজনা এবং বিদেশি সিনেমায় অভিনয় করা একমাত্র দেশীয় চিত্রনায়িকাও তিনি। এ পর্যন্ত তিন শতাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন। দুবার পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার।

প্রবীর মিত্র

খ্যাতিমান অভিনেতা প্রবীর মিত্র (৮১) ৫ জানুয়ারি রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি বেশকিছু শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। প্রবীর মিত্র ১৯৪১ সালের ১৮ আগস্ট চাঁদপুরের নতুনবাজার গুয়াখোলায় মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পুরান ঢাকায় বড়ো হওয়া প্রবীর মিত্র স্কুলজীবন থেকেই নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত হন। তিতাস একটি নদীর নাম, জীবন তৃষ্ণা, সেয়ানা, জালিয়াত, ফরিয়াদ, রক্ত শপথ, চরিত্রহীন, জয়-পরাজয়, অঙ্গার, মিন্টু আমার নাম, ফকির মজনু শাহ, মধুমিতা, অশান্ত ঢেউ, অলংকার, অনুরাগ, প্রতিজ্ঞা, তরুলতা, গাঁয়ের ছেলে, পুত্রবধূ-সহ চার শতাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি।

জেনা রোল্যান্ডস

হলিউডের কিংবদন্তি অভিনেত্রী জেনা রোল্যান্ডস (৯৪) মারা গেছেন। ১৪ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার নিজ বাসায় মারা যান তিনি। দীর্ঘদিন অ্যালঝেইমার রোগে ভুগছিলেন তিনি। ১৯৫৬ সালে 'মিডল অব দ্য নাইট' চলচ্চিত্রে অভিষেকের মাধ্যমে অভিনয় শুরু করেন রোল্যান্ডস। এছাড়াও ওপেনিং নাইট, আনহুক দ্য স্টারস, ইয়েলো অ্যান্ড ব্রোকেন ইংলিশ, হোপ ফ্লোটস, টেম্পেস্ট, দ্য ব্রিঙ্কস জব, টমি রোম এবং দ্য নিয়ন বাইবেল চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন তিনি।

আশরাফুল আলম পিনটু

খ্যাতিমান শিশুসাহিত্যিক, সংগঠক ও সাংবাদিক আশরাফুল আলম পিনটু (৬০) মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ২৭ আগস্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আশরাফুল আলম পিনটু যুগান্তরের ছোটোদের পাতা 'আলোর নাচন', শিশু-কিশোরদের পত্রিকা 'কিশোর' সম্পাদনা করেছেন। এম নুরুল কাদের ফাউন্ডেশন পুরস্কার, ইউনিসেফ মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডসহ বেশকিছু পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন তিনি।

রাহনুমা সারাহ

রাজধানীর হাতিরঝিল থেকে বেসরকারি টেলিভিশন জিটিভির নিউজরুম এডিটর রাহনুমা সারাহর (৩২) মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। ২৮ আগস্ট তাকে পথচারীরা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন

ঊর্মি রহমান

সাংবাদিক ঊর্মি রহমান (৭৪) ১৪ সেপ্টেম্বর ভারতের কলকাতায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ...রাজিউন)। ছাত্র অবস্থায় দৈনিক সংবাদে তার সাংবাদিকতাজীবনের শুরু। পরবর্তী সময়ে দৈনিক বাংলা ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-তে কাজ করেন। বিবিসির সাংবাদিক হিসাবে অবসরে যান তিনি। ঊর্মি রহমান প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, অনুবাদসহ বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

আজমল হোসেন খাদেম

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সভাপতি সাংবাদিক আজমল হোসেন খাদেম (৭৬) আর নেই (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ১৬ সেপ্টেম্বর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর ইস্পালস হাসপাতালে মারা যান তিনি। আজমল হোসেন খাদেম দীর্ঘদিন বাংলার বাণী পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। পাশাপাশি তিনি রেডিও বাংলাদেশের সংবাদ পর্যালোচনাভিত্তিক কথিকা 'সংবাদ প্রবাহ' গ্রন্থনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ১৯৯৮ সালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। জাতীয় প্রেস ক্লাবসহ সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠনের স্থায়ী সদস্য ছিলেন।

সনৎ নন্দী

দৈনিক খবরের বার্তাসম্পাদক সনৎ নন্দী (৭২) ২৩ সেপ্টেম্বর রাজধানীর বারডেম হাসপাতালে ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কিডনি সমস্যাসহ নানা জটিল রোগে ভুগছিলেন। পোস্তগোলা শ্মশানে তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।

রুহুল আমিন গাজী

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতি ও দৈনিক সংগ্রামের চিফ রিপোর্টার রুহুল আমিন গাজী (৬৮) ২৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীর বেসরকারি বিআরবি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন কিডনি, লিভারসহ নানা জটিলতায় ভুগছিলেন।

রুহুল আমিন গাজীর জন্ম ১৯৫৬ সালের ১২ নভেম্বর চাঁদপুর সদরের গোবিন্দিয়ায়। তিনি সাংবাদিকদের শীর্ষ সংগঠন বিএফইউজের চারবার সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি বিএফইউজে মহাসচিব, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) সভাপতি, অবিভক্ত ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া জাতীয়তাবাদী ও ইসলামি সাংবাদিক ফোরামের শীর্ষ নেতা, সম্মিলিত পেশাজীবী ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ছিলেন।

আবদুল গফুর

ভাষাসংগ্রামী ও সাংবাদিক অধ্যাপক আবদুল গফুর (৯৫) ২৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীর স্বামীবাগের একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ...রাজিউন)। জাতীয় প্রেস ক্লাবে জানাজা শেষে তাঁকে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। তমদ্দুন

মজলিসের সদস্য হিসাবে রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন আবদুল গফুর। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাজপথের বিক্ষোভ-সংগ্রামে তিনিও সক্রিয় ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের সময়ে 'সৈনিক' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন তিনি। দৈনিক মিল্লাত, দৈনিক আজাদ, দৈনিক দেশ, দৈনিক নাজাত, দৈনিক ইনকিলাব ও ইংরেজি দৈনিক পিপল পত্রিকায় কাজ করেছেন তিনি।

অঘোর মন্ডল

ক্রীড়া সাংবাদিক অঘোর মন্ডল (৫৮) ২৭ সেপ্টেম্বর বিএসএমএমইউ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। তিন দশকের বেশি সময় সাংবাদিকতা করা অঘোর মন্ডলের পেশাজীবন শুরু নব্বইয়ের দশকে আজকের কাগজে। কাজ করেছেন দৈনিক ভোরের কাগজ, চ্যানেল আই ও দীপ্ত টিভিতে এবং সর্বশেষ এটিএন নিউজের বার্তাসম্পাদক পদে। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসজেএ) ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন অঘোর মন্ডল।

বদিউল আলম

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সাবেক সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা বদিউল আলম (৭৮) ২৯ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ইস্কাটনে নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন কিডনি আক্রান্তসহ বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগছিলেন। জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে রাজধানীর আজিমপুর কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

বদিউল আলম গণকণ্ঠ, দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, নিউজ টুডে পত্রিকায় প্রধান প্রতিবেদক, বিশেষ প্রতিনিধি, সিনিয়র রিপোর্টার হিসাবে কাজ করেছেন। সর্বশেষ তিনি নিউজ টুডেতে সিটি এডিটর ছিলেন।

সীমান্ত খোকন

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভির বার্তাসম্পাদক সীমান্ত খোকন (৫১) মারা গেছেন। ১ অক্টোবর রাজধানীর চামেলীবাগের বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

গোলাম কাদের

বিবিসি বাংলার সাবেক সাংবাদিক গোলাম কাদের ৬ অক্টোবর লন্ডনে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। গোলাম কাদের সাংবাদিকতায় যোগ দেন ষাটের দশকে। পাকিস্তান টেলিভিশন ও বাংলাদেশ টাইমস-এর পর কিছুদিন বিজ্ঞাপনশিল্পেও কাজ করেন তিনি। ১৯৮৪ সালে তিনি বিবিসিতে যোগ দিয়ে লন্ডন যান। বিবিসি থেকে অবসরের পর তিনি লন্ডনের বাংলা পত্রিকা নতুন দিন-এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন। গোলাম কাদের যুক্তরাজ্যে বাংলাভাষীদের মধ্যে বাংলা ফন্টের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

জামালউদ্দিন হোসেন

দীর্ঘ তিন দশক কখনো মধ্যবিত্তের আটপৌরে জীবন, কখনো উচ্চবিত্তের রাশভারী চরিত্রে অভিনয়-দক্ষতায় দর্শকনন্দিত হয়েছেন বিশিষ্ট নাট্যজন, নির্দেশক, অভিনেতা ও একুশে পদকপ্রাপ্ত শিল্পী জামালউদ্দিন হোসেন। সেই সৃজনানন্দের দিনগুলো স্মৃতির অ্যালবামে রেখে তিন দশকের জার্নি থামিয়ে দিয়ে চলে গেছেন না ফেরার দেশে। (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিন দশকের এই পথচলা শেষ হয়ে গেছে ১১ অক্টোবর। কানাডার রকিভিউ হাসপাতালে মারা গেছেন শিল্পী জামালউদ্দিন হোসেন।

তিনি ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন। ১৯৯৭ সালে তিনি তার নিজের নাট্যগোষ্ঠী নাগরিক নাট্যাঙ্গন শুরু করেন। তিনি খাঁচার ভিতর অচিন পাখি, রাজা রাণী, চাঁদ বণিকের পালা, আমি নই, বিবি সাহেব, যুগলবন্দী-সহ বেশ কয়েকটি আলোচিত মঞ্চনাটক পরিচালনা করেছেন।

জামালউদ্দিন হোসেনের জন্ম ৮ অক্টোবর ১৯৪৩ সালে। তিনি বাংলাদেশি চলচ্চিত্র অভিনেতা, পরিচালক ও নাট্যকর্মী। শিল্পকলায় তাঁর অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে তাঁকে একুশে পদক প্রদান করে।

স্বপন কুমার ভদ্র

ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় শম্ভুগঞ্জের মাঝিপাড়ার টানপাড়া এলাকায় ১২ অক্টোবর নিজ বাসার সামনে প্রবীণ সাংবাদিক স্বপন কুমার ভদ্রকে (৬৫) কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তিনি তারাকান্দা প্রেস ক্লাবের সাবেক সহসভাপতি। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত দৈনিক স্বজন পত্রিকায় তারাকান্দা উপজেলা প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। পরে তিনি দৈনিক নবকল্যাণ পত্রিকায় কাজ করতেন। এছাড়াও তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এলাকার বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয় নিয়ে নিয়মিত লেখালেখি করতেন।

শোয়েব মিথুন

ফটোসাংবাদিক শোয়েবুর রহমান মিথুন (৩৭) ২১ অক্টোবর ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের সিনিয়র ফটো করেসপনডেন্ট ছিলেন। তিনি দুরারোগ্য ক্যানসারে ভুগছিলেন।

এনএম হারুন

সাংবাদিক এনএম হারুন (৮০) ১৭ অক্টোবর রাজধানীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। এনএম হারুন তৎকালীন পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় স্টাফ রিপোর্টার হিসাবে সাংবাদিকতা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সি (এনা), সাপ্তাহিক হলিডে, ঢাকা কুরিয়ার, দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, অধুনালুপ্ত দৈনিক ইনডিপেনডেন্ট-সহ বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছেন। সর্বশেষে তিনি দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকা থেকে অবসর নেন।

ফারুক লিটু

দৈনিক ইত্তেফাকের বরিশাল অফিসের ফটোসাংবাদিক জিএম ফারুক লিটু (৫০) আর নেই (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ৩১ অক্টোবর বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। ফারুক লিটু কয়েক বছর ধরে হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন।

মাহবুব উল আলম

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট সাংবাদিক, কলামিস্ট ও গবেষক মো. মাহবুব উল আলম (৮২) নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ২ ডিসেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত নানা জটিল রোগে ভুগছিলেন। মাহবুব উল আলম চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের

সাবেক সভাপতি, সাংবাদিক হাউজিং সোসাইটির সাবেক চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

তসিকুল ইসলাম বকুল

রাজশাহীতে দৈনিক সানশাইনের সম্পাদক তসিকুল ইসলাম বকুল (৬৮) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ৩ ডিসেম্বর নগরীর মেহেরচণ্ডী এলাকার নিজ বাড়িতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

এরশাদ মজুমদার

প্রবীণ সাংবাদিক, কবি, অনুবাদক ও গবেষক এরশাদ মজুমদার (৮৪) আর নেই। ৮ ডিসেম্বর রাজধানীর এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় ইন্তেকাল করেন তিনি (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য এরশাদ মজুমদার ডায়াবেটিস ও হার্টের সমস্যাসহ বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। তিনি সংবাদ, দৈনিক পূর্বদেশ, দৈনিক বাংলার বাণী, দৈনিক জনপদ, প্রকৃতি, ডেইলি নিউজ ও ডেইলি নিউ নেশনে কাজ করেছেন। ১৯৯৮ সালে তিনি সাংবাদিকতা পেশা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

হেলাল হাফিজ

প্রেম ও দ্রোহের কবি হেলাল হাফিজ (৭৬) আর নেই (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ১৩ ডিসেম্বর রাজধানীর শাহবাগে অবস্থিত সুপার হোমের বাথরুমে পড়ে গিয়ে রক্তক্ষরণ হয় হেলাল হাফিজের। হোম কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিএসএমএমইউ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। হেলাল হাফিজ দীর্ঘদিন গ্লুকোমায় আক্রান্ত ছিলেন। পাশাপাশি কিডনি জটিলতা, ডায়াবেটিস ও স্নায়ু রোগে ভুগছিলেন তিনি।

হেলাল হাফিজের প্রথম কবিতার বই 'যে জলে আগুন জ্বলে' ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত বইটির মুদ্রণ হয়েছে ৩৩ বারেরও বেশি। তৃতীয় ও সর্বশেষ বই 'বেদনাকে বলেছি কেঁদোনা' প্রকাশিত হয় ২০১৯ সালে। লেখালেখির পাশাপাশি হেলাল হাফিজ যুগান্তরসহ বিভিন্ন পত্রিকায় দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেন।

দেশে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সময় হেলাল হাফিজের 'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়'র পঙ্‌ক্তি 'এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়' উচ্চারিত হয় মিছিলে, স্লোগানে, কবিতাপ্রেমীদের মুখে মুখে। ২০১৩ সালে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। এর আগে খালেকদাদ চৌধুরী পুরস্কারসহ নানা সম্মাননা পেয়েছেন তিনি।

দ্রোহ আর প্রেমের কবি হেলাল হাফিজের জন্ম ১৯৪৮ সালের ৭ অক্টোবর নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলার বড়তলী গ্রামে। শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য কেটেছে সেখানেই। ১৯৬৭ সালে নেত্রকোনা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। উত্তাল ষাটের দশক হয়ে ওঠে তাঁর কবিতার উপকরণ। তারপর দীর্ঘদিন তিনি কবিতা থেকে দূরে ছিলেন। এবার চিরতরে পৃথিবী থেকেই চির বিদায় নিলেন।

সালেহ আকরাম

দেশের স্বনামধন্য সংবাদ পাঠক সালেহ আকরাম (৭০) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ২২ ডিসেম্বর রাজধানীর বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। টেলিভিশনের বাংলা সংবাদ পাঠক সালেহ আকরাম পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সালেহ আকরামের জন্ম ফরিদপুর জেলায়। সত্তরের দশকে তিনি সংবাদ পাঠক হিসাবে যোগ দেন বাংলাদেশ টেলিভিশনে। শুধু সংবাদ উপস্থাপনাই নয়, বিটিভিতে আশি ও নব্বইয়ের দশকে অনেক অনুষ্ঠানও উপস্থাপনা করেছেন তিনি। পরে তিনি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম বিবিসির সঙ্গে যুক্ত হন।

শ্যাম বেনেগাল

উপমহাদেশের কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্যাম বেনেগাল (৯০) আর নেই। ২৩ ডিসেম্বর মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। এর মধ্য দিয়ে পাঁচ দশকের চলচ্চিত্রজীবনের ইতি ঘটল তাঁর। জীবনীভিত্তিক সিনেমা নির্মাণের জন্য খ্যাত শ্যাম বেনেগাল ভারতীয় সিনেমায় এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন।

১৯৭৪ সালে 'অঙ্কুর' সিনেমা দিয়ে বড়ো পর্দায় নির্মাতা হিসাবে হাতেখড়ি তাঁর। বেনেগাল নির্মিত একাধিক কালজয়ী সিনেমায় মুগ্ধ হয়েছেন আবালবৃদ্ধবনিতা। অঙ্কুর, নিশান্ত, মন্থন থেকে শুরু করে ভূমিকা, সরদারি বেগম ওয়েলকাম টু সজ্জনপুর, আরোহণ, মাম্মো, দ্য মেকিং অব দ্য মহাত্মা, জুবেইদা, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু: দ্য ফরগটেন হিরো, তাঁরই সৃষ্টি। ১৯৭৬ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন শ্যাম বেনেগাল। ১৯৯১ সালে পান পদ্মভূষণ।

কাজী রফিক

অনলাইন নিউজ পোর্টাল ঢাকা মেইলের নিজস্ব প্রতিবেদক কাজী রফিক (৩২) হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ২৭ ডিসেম্বর রাজধানীর জাতীয় হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। কাজী রফিক ২০১৭ সালে সাংবাদিকতা শুরু করেন। নিউজ পোর্টাল ঢাকা টাইমস টোয়েন্টিফোর ডটকমে সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি।

গাজায় আলজাজিরার দুই সাংবাদিক নিহত

অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় কাতারভিত্তিক আলজাজিরার দুই সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলায় ইসমাইল আল গৌল এবং তাঁর সঙ্গে থাকা ফটোসাংবাদিক রামি আল-রিফি নিহত হয়েছেন। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় সময় ৩১ জুলাই গাজা সিটির পশ্চিমাঞ্চলে শাতি শরণার্থীশিবিরে ওই সাংবাদিকদের গাড়িতে হামলা চালানো হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁরা প্রাণ হারান।

বিএফইউজে ও ডিইউজের বিবৃতি

ভারতীয় মিডিয়ায় সংখ্যালঘু নিয়ে মিথ্যা তথ্য প্রচার

ভারতের মূলধারার সংবাদমাধ্যমে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ইস্যু নিয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়ে তৈরি সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে জানিয়ে উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)। ৪ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বিএফইউজের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ওবায়দুর রহমান শাহীন ও মহাসচিব কাদের গনি চৌধুরী এবং ডিইউজের সভাপতি শহিদুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক খুরশীদ আলম এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিএফইউজের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. শাহজাহান সাজু স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমরা অত্যন্ত উদ্‌বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি, সংখ্যালঘু ইস্যুতে ভারতীয় মূলধারার গণমাধ্যমে বাংলাদেশ সম্পর্কে মনগড়া, ভিত্তিহীন অপতথ্য দিয়ে একের পর এক মিথ্যা সংবাদ তৈরি করে প্রচার করা হচ্ছে।' (৫ ডিসেম্বর ২০২৪, কালের কণ্ঠ)

পিআইবি সংবাদ

পিআইবিতে 'ফ্যাসিবাদের কবলে নদী' শীর্ষক সেমিনারে জুলাই শহিদদের স্মরণে নীরবতা পালন করছেন সম্মানিত অতিথিরা

'ফ্যাসিবাদের কবলে নদী' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) ও রিভার অ্যান্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টারের (আরডিআরসি) যৌথ উদ্যোগে 'ফ্যাসিবাদের কবলে নদী' বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে পিআইবি মিলনায়তনে।

সেমিনারের প্রধান অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, 'নতুন করে যে সংবিধান লেখা হবে, তাতে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হবে। উন্নয়ন হলো ফ্যাসিস্টদের শব্দ। উন্নয়নের কথা বলে তারা আমাদের গণতন্ত্র হরণ করেছে, পরিবেশ ধ্বংস করেছে। বর্তমান সরকার নদী হত্যাকারী ফ্যাসিস্টদেরও বিচার করবে।'

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেন, 'আবরার ফাহাদ নদী নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ফ্যাসিস্টদের হাতে শহিদ হয়েছেন। নদী বাঁচাতে আবরার ফাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের পথনির্দেশ করবে। নদী, কৃষি ও পরিবেশ নিয়ে জাতীয় নীতি গ্রহণ করা হবে।'

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আরডিআরসির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এজাজ এবং অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ।

'আয়না ও অবশিষ্ট: গণ-অভ্যুত্থানের পরে সাংবাদিকতা' শীর্ষক সেমিনার

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) ৯ নভেম্বর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটমণ্ডপে 'আয়না ও অবশিষ্ট: গণ-অভ্যুত্থানের পরে সাংবাদিকতা' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করে।

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. সুমন রহমান। আলোচক ছিলেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিসিপ্লিনের প্রধান সারা মনামী হোসেন। সেমিনারে মডারেটর ছিলেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ।

সেমিনারে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ৮০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

ফারুক ওয়াসিফ

পিআইবির মহাপরিচালক হলেন ফারুক ওয়াসিফ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক হিসাবে সাংবাদিক, কবি ও লেখক ফারুক ওয়াসিফকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে তাঁকে দুই বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি সমকালের পরিকল্পনা সম্পাদক হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পিআইবি আইন ২০১৮-এর ধারা ৯(২) অনুযায়ী ফারুক ওয়াসিফকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী দুই বছর মেয়াদে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক পদে নিয়োগ দেওয়া হলো। এ নিয়োগের অন্যান্য শর্ত অনুমোদিত চুক্তিপত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে।

ফারুক ওয়াসিফ বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। সেখান থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। তিনি কাজ করেছেন প্রথম আলো ও সমকাল পত্রিকায়। তাঁর রচিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে–জীবনানন্দের মায়াবাস্তব, বিস্মরণের চাবুক, বাংলার নিজস্ব সেচ ব্যবস্থা (অনুবাদ গ্রন্থ), জল জবা জয়তুন, মার্কিন গোয়েন্দার মুখোমুখি: সাদ্দামের শেষ জবানবন্দি (সম্পাদিত গ্রন্থ), জরুরি অবস্থার আমলনামা ও ইতিহাসের করুণ কঠিন ছায়াপথের দিনে।

দুইদিনব্যাপী ন্যায্য নগর ইশতেহার শীর্ষক আলোচনা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হওয়া দুইদিনব্যাপী 'ন্যায্য নগর ইশতেহার' শীর্ষক সম্মেলনে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেন, একটা শহরের গণপরিবহণব্যবস্থা ঠিক করতে ছয় মাস থেকে এক বছর লাগতে পারে। বছরের পর বছর নাগরিকবান্ধব গণপরিবহণের কথা বলা হলেও সেটা দেখা যাচ্ছে না। নগরকে যদি গড়তে হয়, তাহলে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২০২৪ সালের ১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন পিপিআরসির চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। হোসেন জিল্লুর বলেন, আমাদের ধারণা হচ্ছে, ঢাকার সব স্কুলে মাঠ থাকবে; কিন্তু এটা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে মাঠকে কালেকটিভলি (সবাই মিলেমিশে) ব্যবহারের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। একেক স্কুল একেক সময়ে মাঠ ব্যবহার করতে পারে। যাপিত জীবনের মধ্য থেকেই সমাধান খুঁজতে হবে। আলোচনায় অংশ নিয়ে অধ্যাপক ড. সলিমুল্লাহ খান বলেন, আড়াই হাজার বছর আগেও ঢাকায় একটি শহর থাকার

পিআইবি অডিটোরিয়ামে 'ন্যায্য নগর ইশতেহার' শীর্ষক সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ

অস্তিত্ব মিলেছে। সোনারগাঁয়ে দুই হাজার বছর আগের রোমান মুদ্রা পাওয়া গেছে। অথচ সেই ঢাকা এখন বড়ো ধরনের একটি জেলখানায় পরিণত হয়েছে। ধীরে ধীরে কীভাবে একটি শহর ধ্বংস করা যায়, সেটা আমরা দেখেছি। নগরপরিকল্পনাবিদদের হাতে পরিকল্পনা করার ক্ষমতা নেই। সেটা এখন রাজনীতিকদের হাতে চলে গেছে। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম, ব্লাস্টের সম্মাননীয় নির্বাহী পরিচালক ব্যারিস্টার সারা হোসেন, রাজউকের নগরপরিকল্পনাপ্রধান আশরাফুল ইসলাম, জার্মান প্রবাসী গবেষক পুন্নি কবির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. খোরশেদ আলম, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)-এর শিক্ষক সুমন রহমান, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহবুব মোর্শেদ প্রমুখ।

ফ্যাসিবাদের জমানায় শিকারি সাংবাদিকতা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'ফ্যাসিবাদের জমানায় শিকারি সাংবাদিকতা' শীর্ষক সেমিনার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার অডিটোরিয়ামে ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নিয়াজ আহমেদ খান এবং বিশেষ অতিথি উপ-উপাচার্য ড. মামুন আহমেদ। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আ-আল মামুন। সেমিনারে আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট চিন্তক ও গবেষক ড. সলিমুল্লাহ খান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. খোরশেদ আলম। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ।

'শিকারি সাংবাদিকতা: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা' বিষয়ক সেমিনার

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ১ অক্টোবর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন কমপ্লেক্সে শিকারি সাংবাদিকতার ওপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনার শুরু হয় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সালেহ হাসান নকীব। সভাপতিত্ব করেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আ-আল মামুন।

রংপুরে মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত রংপুর জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (১-৩ অক্টোবর) মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। রংপুর সমাজসেবা কার্যালয়ে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে রংপুরের ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। রংপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শালেকুজ্জামান সালেক প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করেন।

বেসিক জার্নালিজমবিষয়ক প্রশিক্ষণ ঝিনাইদহে

ঝিনাইদহে সম্প্রতি 'বেসিক জার্নালিজমবিষয়ক' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক মহাব্বত হোসেন টিপু।

২০২৪ সালের ২১-২৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) পারভীন সুলতানা রাব্বী, ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর জামিল খান, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব নাজিয়া আফরিন, দৈনিক নবচিত্র পত্রিকার সম্পাদক রকেট আলাউদ্দিন আজাদ, ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল কাজলসহ ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ৩৫ জন সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেন।

অমর একুশে বইমেলায় পিআইবির অংশগ্রহণ

প্রতিবছরের মতো এবারও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) অমর একুশে বইমেলা ২০২৫-এ অংশগ্রহণ করেছে। এবারের একুশে বইমেলার মূল প্রতিপাদ্য ছিল, 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ'। মেলা উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি চত্বরে পিআইবির স্টলটি সজ্জিত করা হয় জুলাই আন্দোলনের ছয় শহিদ সাংবাদিকের ছবি দিয়ে। অমর একুশে বইমেলা ২০২৫ উপলক্ষ্যে পিআইবি একটি বুকলেট ও কিছু বই পুনঃপ্রকাশ করে। সাংবাদিকতা, সংবাদ এবং গণমাধ্যমবিষয়ক গ্রন্থাদির জন্য এবারও পিআইবির স্টলের সামনে পাঠকদের উল্লেখযোগ্য সমাগম লক্ষ করা গেছে।

রাজশাহীতে অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) রাজশাহী জেলার সাংবাদিকদের জন্য সম্প্রতি অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করে। ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণে রাজশাহী জেলার ৩৫ জন সংবাদকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর। বিশেষ অতিথি ছিলেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আ-আল মামুন এবং সিনিয়র সাংবাদিক আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিভাগীয় কমিশনার ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর সাংবাদিকদের সচেতনভাবে সংবাদ উপস্থাপনা করতে পরামর্শ দেন।

রাজশাহী জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী মোবাইল সাংবাদিকতা ও অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন পিআইবি মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ

সভাপ্রধানের বক্তব্যে পিআইবির মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ বলেন, সাংবাদিকদের প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাংবাদিকতা করার দক্ষতা অর্জন করা এখন সময়ের দাবি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন আ-আল মামুন ও আবুল কালাম আজাদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন পিআইবির অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) পারভীন সুলতানা রাব্বী।

'রাষ্ট্র রূপান্তরের সময়ে সাংবাদিকতা' শীর্ষক আলোচনাসভা

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে ২১ জানুয়ারি 'রাষ্ট্র রূপান্তরের সময়ে সাংবাদিকতা' শীর্ষক এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনাসভায় আলোচক ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)-এর গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক সুমন রহমান, বাংলাদেশ হাইকমিশন নয়াদিল্লির প্রেস মিনিস্টার ফয়সাল মাহমুদ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আর রাজী। বিশেষ বক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ শাহ নওয়াজ। আলোচনাসভায় সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ। সভাটি সঞ্চালনা করেন পিআইবির অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক পারভীন সুলতানা রাব্বী।

রংপুরে উপজেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত রংপুর জেলার উপজেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (২৮-৩০ সেপ্টেম্বর) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ রংপুর সমাজসেবা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রংপুর বিভাগীয় কমিশনার মো. আজমল হোসেন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক, উপপরিচালক, রংপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। প্রধান অতিথি মো. আজমল হোসেন অংশগ্রহণকারী ৩৫ জন সাংবাদিকের মাঝে সনদ বিতরণ করেন।

ঠাকুরগাঁওয়ে সাংবাদিকদের বেসিক জার্নালিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী (২০২৪ সালের ৮-১০ ডিসেম্বর) বেসিক জার্নালিজমবিষয়ক প্রশিক্ষণে ঠাকুরগাঁও-এর বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকরা সাংবাদিকতার মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নেন।

সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা এবং সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ। তাঁরা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ২৮ জন সাংবাদিকের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

ঠাকুরগাঁওয়ের বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের বেসিক জার্নালিজমবিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলের সদস্যদের জন্য সংবাদ সম্পাদনাবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন পিআইবি মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ

প্রশিক্ষণ সংবাদ

মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জ জেলার জেলা ক্রীড়া সংস্থা মিলনায়তনে সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী সংবাদ প্রতিবেদন ও বয়ানবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মানোয়ার হোসেন মোল্লা। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক পারভীন সুলতানা রাব্বী। প্রশিক্ষণে মানিকগঞ্জ জেলার ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

নারায়ণগঞ্জ

পিআইবির আয়োজনে নারায়ণগঞ্জ জেলার ৩৫ জন সংবাদকর্মী নিয়ে 'সংবাদ প্রতিবেদন ও বয়ান' বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে তিনদিনের (২৮-৩০ ডিসেম্বর) প্রশিক্ষণ সমাপনে পিআইবির মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান। অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের সনদ প্রদান করা হয়।

সেমিনার

'সংবাদ না বয়ান: গণমাধ্যমের ঝোঁক ও ঝুঁকি' বিষয়ক সেমিনার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান অনুষদে ২৬ জানুয়ারি 'সংবাদ না বয়ান: গণমাধ্যমের ঝোঁক ও ঝুঁকি' বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার এবং আলোচক হিসাবে বক্তব্য দেন কবি, বুদ্ধিজীবী ও ক্রিটিক রিফাত হাসান। মূল আলোচক ছিলেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ। অনুষ্ঠানটিতে সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আর রাজী।

রাজশাহীতে গণমাধ্যমকর্মীদের মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ

রাজশাহীতে মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে আঞ্চলিক লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। তিনদিনের (২৮-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪) প্রশিক্ষণটিতে ৩৫ জন গণমাধ্যমকর্মী অংশ নেন। প্রশিক্ষণের প্রথমদিন পাঁচটি সেশন পরিচালনা করেন জিটিভির নির্বাহী প্রযোজক মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন এবং প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) পারভীন সুলতানা রাব্বী। দ্বিতীয় দিন সেশন পরিচালনা করেন ড. জামিল খান। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ সমাপন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের হাতে সনদ তুলে দেন।

প্রশিক্ষণ সংবাদ

খুলনা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত খুলনা জেলার সাংবাদিকদের জন্য 'সংবাদ প্রতিবেদন ও বয়ান' বিষয়ক প্রশিক্ষণ খুলনা সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষে শেষ হয়েছে। সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. হারুনর রশীদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়ন খুলনার সভাপতি মো. আনিসুজ্জামান ও খুলনা প্রেস ক্লাবের সদস্য সচিব রফিউল ইসলাম টুটুল। সভাপ্রধান ছিলেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ। তিনদিনব্যাপী (২০২৪ সালের ৬-৮ নভেম্বর) এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন খুলনা জেলার ৩৪ জন সাংবাদিক।

গাজীপুর

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে গাজীপুরের সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (২৮-৩০ ডিসেম্বর) সংবাদ প্রতিবেদন ও বয়ানবিষয়ক প্রশিক্ষণ গাজীপুর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণে গাজীপুর জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার ৩৫ জন সাংবাদিক অংশ নেন। সমাপন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মাঝে সনদ প্রদান করেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ।

বগুড়া

বগুড়া জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (২০২৪ সালের ৩০, ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর) সংবাদ প্রতিবেদন ও বয়ানবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বগুড়া ওয়াইএমসিএ অডিটোরিয়ামে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বগুড়া জেলা প্রশাসক হোসনা আফরোজা। বিশেষ অতিথি বগুড়া পৌরসভার সাবেক মেয়র রেজাউল করিম বাদশা। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ।

জুলাই গ্রাফিতি

কারমাইকেল কলেজ, রংপুর

ঢাকা

সিলেট

বিয়াম স্কুল অ্যান্ড কলেজ এলাকা, ঢাকা

কাকরাইল, ঢাকা

সায়েন্স ল্যাব, ঢাকা

রেঞ্জ রিভার্স ফোর্স, চট্টগ্রাম

শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত হল, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

খোকসা সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া

কেডিএ অ্যাভিনিউ রোড, খুলনা

রাজশাহী কলেজ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

রেঞ্জ রিভার্স ফোর্স, চট্টগ্রাম

খুলনা

পিটিআই মোড়, খুলনা

খুলনা

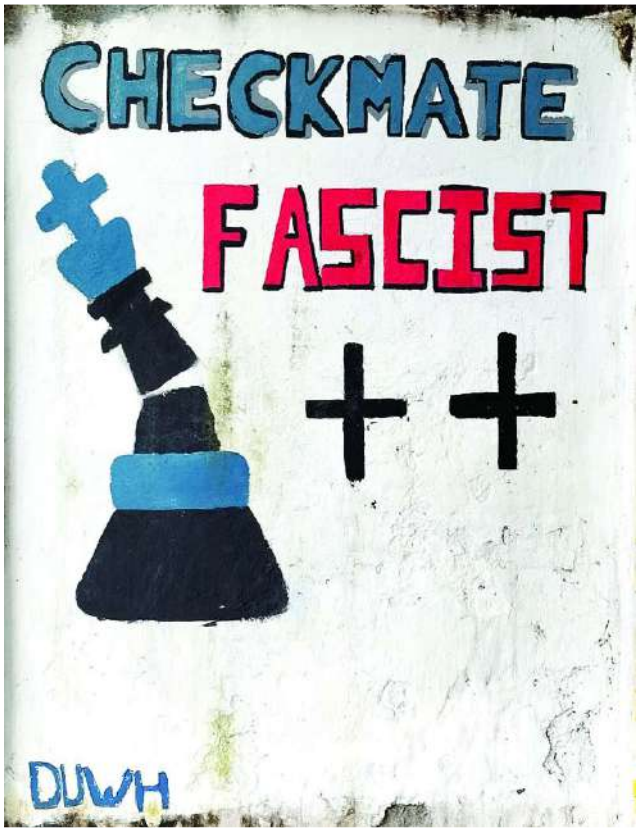

ঢাকা

ঢাকা

মুসলিম বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, ময়মনসিংহ

ঢাকা

ঢাকা

রংপুর জিলা স্কুল

ত্রিশাল থানা, ময়মনসিংহ

সায়েন্স ল্যাব, ঢাকা

খুলনা

রংপুর

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সিলেট

ঢাকা

ঢাকা